সেপ্টেম্বর উনিশ শ' বিরাশি

এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ইনস্যাট

চলচ্চিত্রে বিজ্ঞানভাবনা

হোমিও বিতর্ক

যুদ্ধে বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা
মে-জুন, 1982

সূচী—

		পৃঃ
সম্পাদকীয়		1
চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান-ভাবনা	—সৌমেন গুহ	2
যুদ্ধের সেবায় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান	—মনন সেনগুপ্ত	4
বিতর্কমঞ্চ : হোমিওপ্যাথি		9
রিপোর্ট		15
চিঠিপত্র		15
পরিক্রমা : দূষিত রক্ত মেকী ওষুধ শান্তি আন্দোলন 'মানস'	—সন্ধানী	16

প্রচ্ছদ : রবীন চক্রবর্তী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী লেখা চায়

বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানকর্মীদের সমস্যা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের লেখা পেতে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই। রেফারেন্সে লেখকের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, প্রকাশক, প্রকাশনার স্থান ও সময়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে লেখকের নাম, ঠিকানা ও ডাক-টিকিট সহ খাম থাকা বাঞ্ছনীয়।

যোগাযোগের ঠিকানা : c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ,
52 9C বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-12
(প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা : বার্ষিক পাঁচ টাকা।
স্টলের কমিশন (10 কপি বা তদোর্ধিক) 25%
এজেন্টদের কমিশন : 33%

মানি-অর্ডারে যাঁরা টাকা পাঠাবেন তাঁদের ফর্মের নীচে নাম ঠিকানা লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উৎস মানুষ

কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান আর পিছিয়ে পড়া ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাগজ।

বি.ডি. 494, সল্ট লেক
কলিকাতা 700064

প্রগতি বার্তা

আজগুবি, জনবিরোধী, অভিসন্ধি-মূলক খবর নয়, সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার মত খবর ও বিশ্লেষণ, মানুষের পথ চলার সাথী।

বি 6/119 কল্যাণী, নদীয়া।

পড়ুন ও পড়ান

সম্পাদকীয়। ইনস্যাট-1 ঃ সাফল্য ও সম্ভাবনার খতিয়ান

যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন কিছু দেরী হ'লেও শেষ পর্যন্ত গত 10ই এপ্রিল ভারত আকাশে ছাড়ল কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-1। দু'শ সাতাত্তর কোটি টাকার এই প্রকল্পে প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছে নানান বিভ্রাট, যদিও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে কাটিয়ে উঠছেন তার অনেকগুলিই। ইনস্যাট-1 একটি ভূসমলয় ('জিওসিনক্রোনাস') উপগ্রহ। ভারতের কিছুটা দক্ষিণে 74° পূঃ দ্রাঘিমায় ভূপৃষ্ঠের 36,000 কি. মি. উপরে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির হ'য়ে থাকার কথা এটির। কিন্তু নির্দিষ্ট ঐ জায়গাটিতে ইনস্যাট-1 পৌছেছে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের দশ দিন পর। আকাশে ওঠার পর থেকেই বিকল হ'য়ে গেছিল একটি সংকেত-প্রেরক 'অ্যানটেনা', যার ফলে পুরো উপগ্রহটিই প্রায় অকেজো হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সর্বশেষ খবর, অ্যানটেনাটিকে সক্রিয় করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা, যদিও তার জন্য উপগ্রহটির আয়ু কমে গেছে এক ধাক্কায় অনেকটা। এছাড়া, একটি সৌর পাল ('সোলার সেইল') খারাপ হ'য়ে থাকায় ইনস্যাট-1 কে আকাশে স্থির অবস্থায় রাখতে বেগ পেতে হবে যন্ত্রবিদ্‌দের।

এটা বলা বোধ হয় ভুল হবে না, এইসব বিভ্রাটের অনেকগুলিরই মূল সংশ্লিষ্ট র'য়েছে ইনস্যাট-1 কতটা পরিমাণে 'ভারতীয়' সেই প্রশ্নের সঙ্গে। উপগ্রহটি বানিয়েছে আমেরিকার ফোর্ড এরোস্পেস কমিউনিকেশনস কর্পোরেশন। আর আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'র 'থর ডেলটা 3910' রকেটের সাহায্যে কেপ ক্যানাভেরাল কেন্দ্র থেকে আকাশে ছাড়া হয়েছে এই 'ভারতীয়' উপগ্রহকে। শোনা গিয়েছিল এটিকে মহাকাশে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌছে দেবে 'নাসা'ই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 'নাসা' একে ছেড়ে দিয়েছে একটি নিম্নতর কক্ষপথে। ফলে অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থায়ই এখানকার বিজ্ঞানীদেরকে কাঁধে নিতে হ'ল এই কক্ষপথ থেকে ইনস্যাটকে তার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেওয়ার কাজ। ইনস্যাট-1 প্রকল্পের শতকরা আশীভাগই বিদেশী কারিগরি ও যন্ত্রপাতি একথা স্বীকার করা হয়েছে সরকারী ভাবে। এমন কি পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরকার যোগাযোগের কেন্দ্রগুলিতে যে সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য এ হিসাব। অথচ এসব যন্ত্রপাতির অনেকগুলিই এর আগে এদেশে তৈরী হ'য়েছে; এমন কি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় ব্যবহৃতও হ'য়েছে এসব যন্ত্রপাতি। অবশ্য কর্ণাটকের হাসান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি এই বিদেশনির্ভরতার আংশিক ব্যতিক্রম। যাই হোক, যে প্রকল্পের কলকব্জা যন্ত্রপাতি সমস্তই বিদেশে তৈরী এবং যেগুলি সম্পর্কে এখানকার বিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছুই জানেন না সেটি চালাবার দায়িত্ব এই বিজ্ঞানীদের উপর ছেড়ে দিলে যে নানারকম বিভ্রাট দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক সে কথা পরিকল্পনাকারদের মাথায় এল না কেন বোঝা সত্যিই দুরূহ। এই একই গলদ এর আগে বারবার দেখা দিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ প্রকল্পের অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচীতে। 1975-এ রাশিয়ার মাটি থেকে উপরে ওঠার পরই বিকল হয়ে পড়েছিল আর্যভট্ট। 1979-তে ব্যর্থ হ'য়েছিল প্রথম এস-এল-ভি প্রকল্প, আর 1981-র মে মাসে রোহিনী-2। 1980-তে এস-এল-ভি-3 রোহিনী-1-কে আকাশে ছাড়লেও ঠিকমত কক্ষপথে স্থাপিত করতে পারে নি উপগ্রহটিকে। গত বছর 'অ্যাপ্‌ল' প্রকল্পেও দেখা দিয়েছিল নানা বিভ্রাট। মার্কিন যন্ত্রাংশ সম্বলিত দুটি সৌর প্যানেল অকেজো হ'য়ে থাকা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

শুধু বিদেশী যন্ত্রপাতি ও কারিগরির উপর নির্ভরশীলতা ব'লে নয়, গোটা মহাকাশ কর্মসূচীতেই রয়েছে নানান স্ববিরোধ আর বিকৃত মানসিকতার ছাপ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি ঠিকমত তৈরী না করেই আধুনিকতম কারিগরির ব্যবহার ও প্রয়োগ ঘটাতে গেলে যে বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী তাই প্রকট হ'য়ে উঠছে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচীতে। শুধু জোরালো প্রশাসনযন্ত্র আর বিজ্ঞানীদের মেধার সাহায্যে এই বিকৃতি অপনয়ন সম্ভব নয়। ইনস্যাট-1 এর প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ইনস্যাট-1 সব বিভ্রাট কাটিয়ে শেষপর্যন্ত ঠিকমত কর্মক্ষম হবে তবু আসল প্রশ্ন রয়েই যায়: ইনস্যাট-1 এর এই কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মত ব্যবস্থা কি আমাদের রয়েছে? দৃষ্টান্ত রূপে গ্রামে গ্রামে 'শিক্ষা বিতরণ'-এর পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক। এদেশে গ্রামের সংখ্যা 5·8 লক্ষ মতন। অথচ আপাতত মাত্র 2,000 থেকে 3,000 গ্রামীণ দূরদর্শন যন্ত্র বসানো হবে ইনস্যাট-1 কে উপলক্ষ্য করে। এর সঙ্গে থাকবে মাত্র 340টি বিশেষ ধরনের 'ডাইরেক্ট রিসেপ্‌শন সেট', যার প্রতিটির দাম পড়বে 20 থেকে 25 হাজার টাকা। 1987 সালে এগুলির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 8,000 মত। প্রথম ধাপে মাত্র ছ'টি রাজ্যে পৌছবে ইনস্যাট-1 এর জ্ঞানের আলো। তাও প্রতিদিন মাত্র আড়াই ঘণ্টা ক'রে। অর্থাৎ সামাজিক ও সাংগঠনিক

প্রস্তুতির অভাবে উপগ্রহটির বিরাট সম্ভাবনার প্রায় কিছুই ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। শুধু বৈচিত্র্য বাড়বে শহরের দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান-সিনেমার প্রোগ্রামে। একই কথা প্রযোজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কেও।

এদেশে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই নিম্নমানের যে তা নিয়ে উচ্চবিত্ত ও শিল্পপতি সম্প্রদায়ের মনে দীর্ঘদিনের বিক্ষোভ। ইনস্যাট-এর মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগের বহুসংখ্যক নতুন 'চ্যানেল' সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু নতুন চ্যানেল সৃষ্টি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রেরক ও গ্রাহক কেন্দ্রগুলির যান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো অনেকটা উন্নত না করলে নতুন চ্যানেলগুলি বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। অর্থাৎ ইনস্যাট-1 সত্ত্বেও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা রাতারাতি খুব একটা উন্নত হয়ে যাবে না। এক শহর থেকে আরেক শহরে বার্তা আদান-প্রদানে অবশ্য কিছুটা সুবিধা হয়ত হবে এর দরুন। প্রশ্ন জাগে, আরো সর্বাঙ্গীন ও সুষ্ঠু সমাধানের দিকে না গিয়ে তড়িঘড়ি ইনস্যাট আকাশে ছাড়ার প্রয়োজন সত্যিই ছিল কি? আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা নাকি ইনস্যাট-এর এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। অথচ এ বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণী আঁকজোক ও 'কমপিউটার প্রোগ্রামিং' এখনো তৈরী হয় নি। অর্থাৎ আপাতত বেশ কিছুদিন ইনস্যাট এর পাঠানো খবর খবর শুধু কমপিউটারে জমা পড়ে থাকবে, তা থেকে ঠিকমত আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে না।

তবে ইনস্যাট-এর মত একটা কিছুর প্রয়োজন হয়ত সত্যিই একটা ছিল, যদিও তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিতরণ, টেলিব্যবস্থার উন্নতি বা আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস পাওয়া নয়। কারণ ইনস্যাট থেকে এ সব ব্যাপারে সত্যিকারের ব্যবহারোপযোগী ফল পাওয়া যাবে না খুব বেশী। অন্যান্য দেশের চোখে 'প্রেস্টিজ' অর্জনও হয়ত ইনস্যাট-এর সত্যিকারের উদ্দেশ্য নয়। সাম্প্রতিক কালে মহাকাশবিজ্ঞানকে সামরিক গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগানোর প্রবণতা অত্যন্ত জোরালো। মার্কিন ও রুশ মহাকাশ কর্মসূচীর শতকরা সত্তর ভাগ নিয়োজিত রয়েছে এই সামরিক গোয়েন্দাগিরির কাজে। এদেশে বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ মানুষের সামনে আজ এক অত্যন্ত জরুরী দায়িত্ব হ'ল, মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের সংস্থান করার বদলে সামরিক উদ্দেশ্যে যাতে কষ্টার্জিত সম্পদ স্থানান্তরিত না করা হয় সে বিষয়ে কার্যকর জনমত গড়ে তোলা। দেশের 'প্রতিরক্ষা'র প্রশ্নটি এ প্রসঙ্গে অবান্তর। আর 'প্রতিরক্ষা'র প্রশ্ন যদি তোলাই হয় তবে পাল্টা প্রশ্ন উঠবে, বিদেশী যন্ত্রপাতিতে তৈরী একটি ব্যবস্থার সাহায্যে কোন সামরিক পরিকল্পনা নিলে তা আমাদেরই বিরুদ্ধে বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে না ত?

চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান ভাবনা

টালীগঞ্জ পাড়ার টেকনিসিয়ান স্টুডিওর চত্বরে নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি কাজে গিয়েছিলাম। জড়োসড়ো হয়ে একটি রঙীন বাংলা চলচ্চিত্রের ভাবিং করা বাধ্য হয়েই দেখতে হোল। স্বাস্থ্যবান কেতাদুরস্ত পরিচালক মহাশয় রাগারাগি করছিল একস্ট্রাদের ওপর—কারণ, "জয়, শ্রীরামচন্দ্রের জয়" কথাটি সমস্বরে ঠিক হচ্ছিল না। পরে বুঝেছিলাম, চলচ্চিত্রটির নাম 'সীতা'। জেনেছিলাম ঐ প্রচণ্ড দাপটে পরিচালনা করছিল 'বাবা তারকনাথ' চলচ্চিত্রের পরিচালক মহাশয়। টালীগঞ্জ পাড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দর্শকদের ওপর অসামান্য ক্ষমতাশীল এই মহাশয়েরাই।

বাজারে খোলাখুলি তুকতাক, দৈবশক্তি বা ঈশ্বরভক্তির চলচ্চিত্র কম নয়। বাংলায় বা ভারতীয় যে কোন ভাষাতেই এদের প্রাদুর্ভাব। ভারতীয় চলচ্চিত্রের একদম জন্মলগ্ন থেকেই এই অতি-মানবিক কাণ্ড কারখানার গোড়াপত্তন হয়। স্বয়ং দাদাসাহেব ফালকে প্রায় সত্তর বছর আগেই (1913) 'রাজা হরিশচন্দ্র' থেকে শুরু করে 'লঙ্কাদহন', 'কালীয়-মর্দন', 'গঙ্গাবতরণ', ইত্যাকার শতাধিক চলচ্চিত্র সারা জীবন ধরে তৈরী করে। তখনকার চলচ্চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত ধর্মীয় বা পুরানকাহিনী। উৎসাহটাও এসেছিল পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রে খৃষ্টের কাহিনী দেখে। চিরাচরিত চলচ্চিত্রের এই ধারা পাকা রাস্তা ধরে অবিরাম তৈরী করেছে 'সতীর দেহত্যাগ', 'আদ্যাশক্তি মহামায়া', 'মহাতীর্থ কালীঘাট', 'সন্তোষী মা', 'বাবা তারকনাথ' ইত্যাদি। সরাসরি দৈবশক্তির বর্ণনা ছাড়াও আরও কিছু চলচ্চিত্র একই ভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভরে থাকে। আপাতভাবে, জীবনকাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র 'রানী রাসমণি', 'সাধক বামাক্ষ্যাপা', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ইত্যাদি সেই জাতের।

চলচ্চিত্রে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস দেখানো হলেও এর নির্মাতারা প্রয়সা কামানোতেই বিশ্বাসী। নানারকম বিশেষ কলাকৌশলকে প্রয়োগ করে চলচ্চিত্রে এরা দেখাতে পারে—খড়্গ থেকে জীবন্ত সাপ, হনুমানের সাগর-লম্ফনদেবতার হঠাৎ আবির্ভাব, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি অনায়াসেই। বাস্তব জীবনে দৈবক্ষমতা প্রমাণ করার থেকেও চলচ্চিত্রের কলাকৌশলে এটা লক্ষগুণ সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমী চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও দেখা যাবে 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস' বা 'হারকিউলিস' এর পিছনে কোটি

কোটি টাকার লগ্নী, বিশ্বব্যাপী বক্স-অফিস সাফল্য। টেন 'কমাণ্ডমেণ্টস' একবার 1923 সালে প্রথমে তৈরী করে বক্স অফিস যাচাই করে নিয়েছিল প্রযোজক সেসিল বি. ডেমিল। ফলে 1956 সালে বহু টাকা ব্যয়ে আর একবার তৈরীর ব্যবস্থা করলো ডেমিল। শুধু বাইবেলের কাহিনী নয়, ভূত প্রেতের গল্প বলার ব্যাপারেও পশ্চিমের 'ড্রাকুলা' ইত্যাদির সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলায় এ সছে 'ভৈরবমন্ত্র', 'নিয়তি' অথবা 'কঙ্কাল'। স্নায়ুকে হিমশীতল করে অতিপ্রাকৃত কাণ্ডকারখানায় দর্শকরা নিয়ে গেছে এক ভয়-ধরা বিশ্বাসকে। এক নেশাগ্রস্ত জনবাহিনীর পকেটের পয়সা পাওয়ার এই সরল বন্দোবস্ত—পাশ্চাত্যে পরীক্ষিত। প্রাচ্যও পিছিয়ে নেই। সমাজ সম্পর্কে ক্ষতিকারক ধারণা সম্বলিত চলচ্চিত্রের বহুমুখী আলোচনায় এখানে না গিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়মের বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাবিরোধী চলচ্চিত্রের স্থূল রূপটাকে ধরতে পারা কঠিন নয়।

একেবারে গ্যারাণ্টি দিয়ে সারা বিশ্বের কথা বলতে পারবো না। তবু মনে হয় নিছক দৈবশক্তি বা ভূত প্রেতের কাণ্ডকারখানা নিয়ে চলচ্চিত্রের সংখ্যা পশ্চিমী দেশগুলোতে ভারতের থেকে কম। এটার বহু কারণের মধ্যে কয়েকটা হয়তো এ রকম—পশ্চিমে সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের জন্য, স্থূল বিজ্ঞানবিরোধী মানসিকতা অন্যভাবে চলচ্চিত্রে বলতে হয়; চলচ্চিত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে পশ্চিমে যে পরিমাণ বাস্তবতার ছবি বা অ-কাহিনী চিত্র বিকশিত হয়েছে, তাতে স্থূল বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য বাধা প্রাপ্ত; তার সাথে এটাও খানিকটা সত্যি, বিজ্ঞানচর্চায় পেশাগত দক্ষ কিছু মানুষ বিশ্বের চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। অন্তত এগুলো বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একান্ত বিরল ব্যাপার। চলচ্চিত্র উৎপাদনে এখন ভারত বিশ্বে এক নম্বর! হয়তো সাধুবাবা তৈরীতেও প্রথম! কিন্তু এখনও অ-কাহিনী বা তথ্যচিত্র বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চলচ্চিত্র তৈরীতে অনেক অনেক পেছনে। এ রকম চললে তাই থাকবেও।

গা-ছাড়াভাবে অনেকেই বলবে চলচ্চিত্র মানুষের ওপর, বিশেষত কৈশোরে প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের বক্তব্য ঠিকই কিন্তু বক্তারা খুব বেশী ভেবে চিন্তে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি পশ্চিমে রীতিমত 'চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব' বলে বিষয়টি গড়ে উঠেছে গত চল্লিশের দশকেই। তিরিশের দশকেই প্রশ্ন উঠেছে আমরা কি চলচ্চিত্রের সৃষ্টি? [R. Moley-র গ্রন্থটি 'Are we Movie-made?' (1938)] কিছু মানুষ চলচ্চিত্র গড়ে, আর চলচ্চিত্র বিশাল জনসাধারণকে গড়ে তোলে। রাজনীতির গবেষক জে. পি. মেয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বের ওপর গবেষণা করে দেখায়—অসংখ্য কিশোর মনের মধ্যে ভয়, কল্পনা-বিলাস, যৌনমুখীনতা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ও বিচিত্র চলচ্চিত্রের প্রভাবে। মেয়ারের পথিকৃৎ গবেষণা (Sociology of Film গ্রন্থ) দেখে মনে হয়—চলচ্চিত্রের প্রতি দৃশ্য সুপরিকল্পিত হতেই হবে, যদি ভালো কিছু পৌঁছে দিতে হয় মানুষ-গড়ার মাধ্যমটিতে। ভোঁতা তর্ক নয়—দর্শকদের কাছে এ মাধ্যমটি অতি বিপজ্জনক। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রায়ই ইনটেলেকচুয়াল চালাকির বিপরীত সিদ্ধান্ত এনে দেয়। পাকা ব্যবসায়ীরা এ কথা জানে—অনেক প্রগতিবাদী খবর রাখে না।

পেশাগত বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই বিজ্ঞানমনস্ক চলচ্চিত্র করবে—এমন কথা নেই। তবু বিশ্বের চলচ্চিত্রে একট বাস্তবধর্মী ধারা গড়ে তুলেছে সত্যি কিছু বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকার। রাশিয়ার বিপ্লবী চলচ্চিত্রে বিরাট বাস্তবধর্মীতার আন্দোলন গড়ে তোলায় প্রথমে নাম মনে পড়ে—স্নায়ুশরীরতাত্ত্বিক জিগা ভের্তভ্-এর। ভের্তভ্ প্রথম নিছক বাস্তবচিত্র তৈরীর মতবাদ গড়ে তোলে, রুশ বিপ্লবের পরেই। সের্গেই আইজেন্‌স্টাইন এসেছে তার পরে – সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে চলচ্চিত্রে। তার সঙ্গেই রসায়নের ক্ষেত্র থেকে আসে ভি. আই পুদভ্‌কিন্। পুদভ্‌কিন্ ম্যাক্সিম গোর্কি-র 'মা' চলচ্চিত্র করার আগে পাভলভের গবেষণার ওপর একটি চলচ্চিত্র তৈরী করে। এদের মধ্যে—ভের্তভের ছবিতে গল্প থাকতো না। আর আজো অতি-আধুনিকতম প্রগতিশীল চলচ্চিত্র তৈরীতেও ভের্তভ এখনও পথিকৃৎ। ঠিক এমনি সময় আমেরিকায় খনিজপদার্থবিদ্ রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি—গবেষণার কাজের ফাঁকে 'নানুন অফ্ দি নর্থ' চলচ্চিত্রটি তৈরী করলো। শুরু হলো চলচ্চিত্রে নতুন ধারা। তিরিশের দশকে প্রকাশিত হলো সংগ্রামী চলচ্চিত্রকার জরিস্ ইভেনস্ – ফটো-কেমিক্যাল্‌স্ আর অপ্‌টিক্সের শিক্ষায় শিক্ষিত। হল্যাণ্ডের ইভেনস্ চলচ্চিত্র করতে ছুটে গেছে—বিশ্বের যেখানে মানুষ সামাজিক সংগ্রাম করছে। বাস্তবচিত্রে আরো নতুন ধারা তৈরী হলো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করতে গিয়ে—জাঁ রুশ আর এডগার মরিন-এর হাতে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়াও, বহু ক্ষেত্রের কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী অ-কাহিনী চলচ্চিত্রের ধারা, বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি নিখুঁততাবে চলচ্চিত্রে ধরে রাখার ধারা—যার থেকে এখনো আমরা দূরে। পশ্চিমে এখন অসংখ্য অ-কাহিনী চিত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে, গবেষণার প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে অসংখ্য বিজ্ঞাননির্ভর চিত্র। নিছক ক্লাশ ঘরে বা সাধারণ দর্শক-শ্রোতা সমাবেশে—এখন ওরা চলচ্চিত্র ছাড়া ভাবতে পারে না। ম্যাগ্রহিল্ সংস্থা বা ইণ্ডখেন ইণ্টার-ন্যাশান্যালের তালিকায় বিচিত্র বিজ্ঞানের চলচ্চিত্র। ভারতের ফিল্ম ডিভিশন বিদেশ থেকেই নিয়ে আসে কয়েকটা বিজ্ঞানের ফিল্ম। ভারতে কয়েকটি সংস্থা অবশ্য সামান্য কয়েকটা চলচ্চিত্র তৈরী করে। এ দেশে বিজ্ঞানের ছবি বলতে প্রায় সবই ইংরাজী ভাষায়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়া, অ-কাহিনী চলচ্চিত্রের বিশাল দুনিয়াটা এখনো অগোচর এখানে। শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ফ্রেডারিক ওয়াইস্‌ম্যান-এর 'হাইস্কুল', এখানে ভাবতেই পারি না, বা, 'টিটিকাট ফলিস'-এর মতো চলচ্চিত্র এখানে মানসিক হাসপাতালের নগ্নরূপ খুলে ধরে না। ক্লান্তিকর কাহিনীচিত্রের ভিড়ে, দেবতা-ভূত-প্রেত শক্তিতে বাস করছে এখানে।

পাল্টা চলচ্চিত্র তৈরীর বা আন্দোলনের ভাবনায় বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব এখানে অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য!

প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই কিছু সরকারী প্রচারচিত্র ও সংবাদচিত্র, তার সাথে দু' একটি সামাজিক সমস্যার তথ্যচিত্র, আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে। ওয়াকিবহাল মহলই জানে, সরকারী বিলি-বন্দোবস্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিতান্ত ঢিলেঢালা। সার্বিক একটা অকাহিনী চলচ্চিত্রের বাজার নেই বলেই, সরকার হলো সব থেকে বড় ক্রেতা ও পরিবেশক। অর্থাৎ, প্রায় বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্রের একচেটিয়া আড়তদার। এদিকে চলচ্চিত্র নির্মানে মননশীল ক্ষমতা এবং সাহসিকতার নিতান্ত অভাবে—এদেশের চলচ্চিত্রকারেরা বিজ্ঞানমনস্ক বিষয়বস্তুর চলচ্চিত্রায়ন বা তথ্যনির্ভর অকাহিনী চলচ্চিত্রের কথা ভাবতে পারে না (কয়েকদিন আগে দীর্ঘ বছরের তথ্যচিত্র নির্মাতা শান্তি চৌধুরীর মৃত্যুতে নীরবতা লক্ষনীয়)। তথ্যনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক অকাহিনী চলচ্চিত্রের জন্য যে পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হয় তাতে অনেকেরই আপত্তি আছে। ভাচ্ চলচ্চিত্রকার বার্ট হান্‌স্ত্রা'-র 'এপ এ্যাণ্ড সুপার-এপ' চলচ্চিত্র যে বিজ্ঞানমনস্ক সামাজিক বক্তব্য রাখতে পারে এটা আমাদের ধারণার অতীত। তাই চলচ্চিত্রের বিজ্ঞানভাবনার ভেতরের শক্তি ও বাইরের শর্ত—দুটিই এখানে অনুপস্থিত।

কলকাতায় নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখা যায় বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউসিয়ামে মঙ্গল থেকে রবিবার প্রতিদিন। খরচ 50 পয়সা। নিজের ইচ্ছেমত ভিডিওচিত্র দেখা যায় আমেরিকান লাইব্রেরীতে সোম থেকে শনি প্রতিদিন—বিনা পয়সায়। এ দুটি ছাড়া কলকাতায় বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনের আর কোন ব্যবস্থা নেই বলেই জানি। যারা খানিকটা সচেতন তাদের কাছে এ দুটি কেন্দ্রের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু বাকি যে অসংগঠিত ও অনিয়ন্ত্রিত বিপুল জনসাধারণ রয়েছে তাদের কাছে বিজ্ঞানমনস্ক চলচ্চিত্র পৌছবার ব্যবস্থা নেই। ইদানীং বিভিন্ন গণআন্দোলনের প্রচেষ্টার মধ্যে চলচ্চিত্রকে বিজ্ঞানমনস্কতা বা বিজ্ঞান-রুচি বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অসুবিধা অনেক। সহজলভ্য বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্রগুলি প্রায় সব কটিই ইংরাজী ভাষায়। অর্থাৎ এগুলিকে বাংলা ভাষায় তাৎক্ষণিক অথবা স্থায়ী ভাবে অনুবাদ করতে হবে। আবার সব চলচ্চিত্রই সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব ব্লকেই সরকারী প্রজেক্টর আছে। কিন্তু সরকারী ঢিলেমি কাটিয়ে এগুলিকে ব্যবহার করা কঠিন। বিড়লা মিউসিয়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে, সীমিত ক্ষেত্রে।

এছাড়া নিয়মিত বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্রের আলোচনা দরকার। তার সাথে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে বিজ্ঞানবিরোধী চরিত্রের সমালোচনা করা দরকার। একটা পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার, যেখানে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতেও বিজ্ঞানভাবনা একটা আলোচ্য বিষয়। আর, এই আলোচনা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।

সৌমেন গুহ।

যুদ্ধের সেবায় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান

অস্ত্র উদ্ভাবনের কাজে বিজ্ঞানীদের, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী কলাকুশলী ও পদার্থবিদ্‌দের ব্যাপক ও সরাসরি আত্মনিয়োগ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। তারপর থেকে বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে সামরিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের ভূমিকা বহুগুণ বৃদ্ধিই পেয়েছে, কারণ ঐ সময়ে বৃহৎ শক্তিগুলি যে যুদ্ধ-অর্থনীতি (war economics) চালু করে তা যত দিন যাচ্ছে তত জোরদার হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে প্রায় 400,000 বিজ্ঞানী সরাসরি যুদ্ধ গবেষণায় লিপ্ত। এটি বিজ্ঞানী-দের মোট সংখ্যার প্রায় শতকরা 40 ভাগকে নির্দেশ করে। যদি শুধু-মাত্র পদার্থবিদ্ ও ইঞ্জিনিয়ারদের গোনা হয় তবে অবস্থাটা দাঁড়ায় এরকম : শতকরা 50 ভাগ তাঁদের জীবিকা অর্জন করেন এবং সৃজনীশক্তির 'সু'প্রয়োগ করেন নতুন নতুন ধ্বংসের কায়দা আবিষ্কারে এবং সেগুলিকে আরো নিখুঁত করার কাজে। আর এই মর্মান্তিক সমরযজ্ঞের পিছনে বছরে খরচের পরিমাণ হোল প্রায় 30,000 মিলিয়ন ডলার, শান্তিপূর্ণ গবেষণায় মোট যা খরচ হয় তার থেকে অনেক বেশী[1]।

আন্তর্জাতিক সমরপ্রচেষ্টায় বিজ্ঞান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ যেভাবে বিধ্বংসী যুদ্ধের জন্য প্রচেষ্টা আর প্রস্তুতি চ'লছে, এর আগে আর কোনদিন তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। একদিকে 'উন্নত' দেশগুলি মজুত ক'রছে 'উন্নত' ধরনের মারণাস্ত্র আর অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে এরা সরবরাহ করে চলেছে অবিশ্বাস্য পরিমাণ সমরোপকরণ। 1949 থেকে 1980-র মধ্যে সারা দুনিয়ায় সমরিক খাতে ব্যয় বেড়েছে চার গুণ। 1980 সালে যুদ্ধাস্ত্রের পিছনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 50 হাজার কোটি ডলার। এর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অংশ শতকরা ষোল ভাগ। এই দেশগুলির সংগৃহীত মোট যুদ্ধাস্ত্রের শতকরা 75 ভাগ এসেছিল আমেরিকা আর রাশিয়া এই দুই বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে। ইতিমধ্যেই ইজ্রায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত ও আর্জেন্টিনার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা এসেছে। উন্নত দেশগুলি যদি তাদের ব্যবসা চালিয়ে যায় তবে এই দশকেই আরো আট-দশটি দেশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার অভিমুখ ক্রমশ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন সমরোপকরণ উদ্ভাবনের দিকে। সারা পৃথিবীর সব চাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের শতকরা 40 জন এখন নিযুক্ত রয়েছেন সামরিক গবেষণায়। এঁদের মোট সংখ্যা হবে চার লক্ষ মত। সামরিক খাতে মোট ব্যয়ের 10 শতাংশ নিয়োজিত হচ্ছে 'আর-অ্যাণ্ড-ডি'র পিছনে।

এই ব্যপক যুদ্ধগবেষণার ফলেই তৈরী হয়েছে নিউট্রন বোমা, তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেপনাস্ত্র। পৃথিবীকে ঘিরে মহাশূন্যের বুকেও শকুনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সামরিক উপগ্রহগুলি। গত বছর ছাড়া হয়েছিল এই ধরনের 103টি কৃত্রিম উপগ্রহ, যার ভিতর 14 টি ছিল আমেরিকার আর 89টি রাশিয়ার। এছাড়া রয়েছে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র। আমেরিকার ভাণ্ডারে আজ মজুত আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টন বিষাক্ত রাসায়নিক। সোভিয়েত রাশিয়ায় মজুত আছে সাড়ে তিন লক্ষ টন। (সূত্র : স্টেট্‌সম্যান 23/12/81; BARC, ট্রম্বে থেকে প্রকাশিত 'নিউক্লিয়ার ইনফর্মেশন বুলেটিন' খণ্ড 9, সংখ্যা 3-4, 1981; স্টকহল্‌ম ইনটারন্যাশনাল পীস রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের 1980 সালের বার্ষিক পুস্তিকা; লণ্ডনের ইনস্টিট্যুট অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট)।

এরকম বিশাল এক কর্মকাণ্ডে কিছু না কিছু 'সাফল্য' আসবেই, এবং এর ফলে মিলিটারির ধ্বংসের ক্ষমতা যে কি অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে তা দুটো উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। হিরোশিমায় যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় তার বিস্ফোরণক্ষমতা ছিল প্রায় 12000 টন TNT। এবং ওজন ছিল প্রায় 4 টন। অর্থাৎ yield-to-weight অনুপাত ছিল প্রায় 3000। পক্ষান্তরে আমেরিকার Minuteman III নামের ICBM -এ (Inter-continental Ballistic Missile) যে পারমাণবিক অস্ত্রমুখ (warhead) লাগানোর পরিকল্পনা আছে তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রায় 370,000 টন TNT, অথচ ওজন মাত্র 0.1 টন। অর্থাৎ yield-to-weght অনুপাত দাঁড়ায় 4000,000 - তাত্ত্বিক সীমার প্রায় কাছাকাছি। হিরোশিমার বোমাটি ফেলা হয় B-29 বোমারু বিমানের সাহায্যে, এবং এর লক্ষ্যভেদের সূক্ষ্মতা (accuracy) নির্ভরশীল ছিল প্রধানত পাইলটের দৃষ্টিশক্তির উপর। অবস্থাটা এতদূর 'খারাপ' ছিল যে এক্ষেত্র সঠিকভাবে CEP র (Circular Error Probability) মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভবই ছিল না। CEP হোল লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র ক'রে সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ যার মধ্যে প্রয়োগ করা অস্ত্রের শতকরা 50 ভাগ আঘাত করে। আধুনিক ICBM-এর CEP, 15000 k.m. দীর্ঘ গতিপথের শেষেও 200 মিটার বা তার কাছাকাছি, এবং আধুনিকতম কিছু ICBM -এ, যেমন MX-এ (Missile Experimental), CEP-র মাত্রা 100 মিটারের কাছাকাছি বা কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র 15 থেকে 20 মিটার করার পরিকল্পনা আছে। সামরিক প্রযুক্তির এই আশাতীত উন্নতি শুধুমাত্র বিগত কয়েক দশকের প্রচেষ্টার ফল, এবং এই 'উন্নতির' গতি উর্দ্ধমুখী। আগামী কুড়ি-তিরিশ বছরে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা ভাবতেও ভয় লাগে। কারণ আমাদের মতন সাধারণ মানুষের এবং পুরো পৃথিবীর ভাগ্য এর সাথে দু'রকমভাবে জড়িত। প্রথমত, সীমিত এবং কষ্টার্জিত সম্পদের অপব্যবহার, যেখানে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রোগব্যাধি—এগুলির আশু সমাধানই যে কোন প্রচেষ্টার একমাত্র মানবিক লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এ নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিকটি আরো ভয়াবহ—মানুষের প্রাণী হিসাবে বেঁচে থাকার (Survival of Humankind) প্রশ্নটিও চিন্তাবিদ্‌দের মতে আজ আর সংশয়াতীত নয়।

একটি সুচিন্তিত অভিমত[2] হোল এই দুঃখজনক মারাত্মক পরিস্থিতির জন্য ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ্ নয়, বিজ্ঞানীরা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী। বর্তমান বৃহৎ-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিজ্ঞানের যুগে পাশ্চাত্ত দেশগুলিতে বিজ্ঞান, বিশেষত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি বড় অংশ আসে মিলিটারি বাজেট থেকে, এবং স্বাভাবতই যুদ্ধের কাজে অথবা নতুন অস্ত্র তৈরীতে সহায়ক হতে পারে এরকম গবেষণাই প্রাধান্য পায়। এইরকম পরিস্থিতি শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধের সময় থেকে, যখন সামরিক বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরী করে। আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর বিদায়ী সম্ভাষণে আমেরিকার জনসাধারণকে সেই সময়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন **military-industrial complex** সম্পর্কে। সেটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে **military-industrial-bureaucratic-academic complex**। প্রতিরক্ষার জিগির তোলা এবং যুদ্ধ গবেষণায় আরো বেশী বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা এখনও এক বিরাট কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এতদিন যাবত এত বেশী অর্থ-সম্পদ এর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে যে সামরিক প্রযুক্তি এখন নিজেই এক বিরাট সামাজিক শক্তি, এবং এর গতি রোধ করা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে প্রবাদবাক্য ছিল, **"The political dog wags the military-technological tail"**। এখন বলা যেতে পারে[2]— **"The military-technological tail wags the political dog"**।

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় একটি নতুন পেশার কথাও এ প্রসঙ্গে প্রায়ই শোনা যায়—**defence intellectual** অর্থাৎ 'সামরিক বুদ্ধিজীবি'। এঁরা যুদ্ধের strategy, tactics, casualties—এসব নিয়ে খুব নির্লিপ্তভাবে আলোচনা করেন, এবং ইদানীংকালে কেউ কেউ মনে করেন যে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে সত্যি সত্যিই যুদ্ধ লড়া এবং তাতে জয়ী হওয়া সম্ভব। ক্ষয়ক্ষতির বিভীষিকাময় সম্ভাবনা এঁদের কাছে অনুভবহীন পরিসংখ্যান মাত্র, এবং নিজেদের নিউরোটিক মানসিকতার সপক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃত অর্থ দান করাতেও এঁরা পিছপা নন। উদাহারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার 20 মিলিয়ন লোক মারা যায়, তবুও রাশিয়া আজ এক সফল শক্তিশালি সমাজ। সুতরা —পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা এমন কিছু দুশ্চিন্তার কারণ নয়। এমনকি বিকৃত তথ্যের সন্ধানে ইতিহাসের আরো পিছনে যেতেও আপত্তি নেই। কানাডার টরন্টো (Toronto) শহরে American Association for the Advancement of Science—এর সাম্প্রতিক এক সভায় আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ডাক্তাররা পারমাণবিক যুদ্ধে ভয়াভয় সংখ্যক হতাহতদের সাহায্যার্থে যে কোন প্রকারের চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা আলোচনা করেন। তখন প্রশ্নোত্তরের সময়ে লস অ্যালামোস শহরের weapons laboratory-র একজন 'বিজ্ঞানী' উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন যে মধ্যযুগে যে প্লেগ রোগে অগুন্তি মানুষের মৃত্যু হয়, তা সত্ত্বেও তো কই কোন সমাজ অথবা সভ্যতাই ভেঙ্গে পড়ে নি।

বিজ্ঞান গবেষণার অপপ্রয়োগের উদাহারণ..শুধুমাত্র অস্ত্রই নয়। মহাকাশ গবেষণাও নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত মিলিটারির স্বার্থে, যদিও সাধারণ মানুষের কাছে এর অন্যান্য মহৎ উদ্দেশ্যের কথাই তুলে ধরা হয়।

সামরিক গোয়েন্দাগিরিতে মহাকাশবিজ্ঞান

এ পর্যন্ত যত কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হয়েছে তার 70 শতাংশেরও বেশী সামরিক উদ্দেশ্যে। দুই বৃহৎ শক্তি পরস্পরের সামরিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য আর অন্যান্য দেশের উপর গোয়েন্দাগিরির জন্য কাজে লাগায় উপগ্রহগুলিকে। 1974 এর মে মাসে পোখরানে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের খবর সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই খুব সম্ভব জানতে পেরেছিল বৃহৎশক্তিগুলি। ঐ সময় পোখরানের কাছ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল মার্কিন 'বিগ বার্ড' আর রুশ 'কসমস' 652 ও 653। 1977 সালে কালাহারি মরুভূমিতে দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা করতে উদ্যত হলে তা রুশ ও মার্কিন গোয়েন্দা উপগ্রহের নজরে পড়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তখনকার মত বিস্ফোরণ বন্ধ করা হয়।

গোয়ন্দা উপগ্রহগুলিকে চারভগে ভাগ করা যায়. মার্কিন 'বিগ বার্ড' ও রুশ 'কসমস' শ্রেণীর অনেকগুলি উপগ্রহ খবর সংগ্রহ করে আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফির মাধ্যমে। এগুলির কর্মপদ্ধতি আবার দু' ধরণের হতে পারে। সূক্ষ্ম কাজের জন্য ফটো তুলে সেই ফিল্ম ফেরৎ পাঠানো হয় পৃথিবীতে (উপগ্রহ থেকে এইভাবে পৃথিবীতে প্রথম ফিল্ম ফেরৎ এসেছিল 1960 সালে মার্কিন 'ডিসকভারার-13' থেকে)। আর মোটা দাগের কাজের জন্য উপগ্রহর ভিতরই ছবি বিশ্লেষণ করে বার্তা পাঠানো হয় পৃথিবীতে। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরির কাজে 'বিগ বার্ড' এতই দক্ষ যে 1976 সালের পর থেকে আমেরিকা গড়ে বছরে মাত্র একটি করে এই জাতীয় উপগ্রহ আকাশে পাঠাচ্ছে। নতুন আরেকটি উপগ্রহ KH-11 তৈরী সফল হলে মহাকাশের গোয়ান্দাগিরিতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে আমেরিকা। রুশ উপগ্রহগুলি একটু অন্য ধরনের। এগুলির আয়ু মাত্র কয়েক দিন করে। তাই সংখ্যায় অনেক বেশী উপগ্রহ আকাশে ছাড়তে হয় সোভিয়েত রাশিয়াকে। কয়েকটি উপগ্রহে রাশিয়া আবার মহাকাশচারীও পাঠিয়েছিল। 1974 ও 1976 সালে প্রেরিত মহাকাসমঞ্চ 'স্যালিউট'3 আর-5 এর দৃষ্টান্ত। আমেরিকারও এই ধরনের উপগ্রহের পরিকল্পনা আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা উপগ্রহগুলির উদ্দেশ্য প্রধানত আন্তঃমহাদশীয় ক্ষেপনাস্ত্রগুলিকে সনাক্ত করা। 'মিডাস' ও 'রিয়োলাইট' উপগ্রহগুলির মাধ্যমে আমেরিকা ইতিমধ্যেই এই জাতীয় উপগ্রহের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গেছে। 1980 সালে এই ধরনের পাঁচটি রুশ উপগ্রহ আকাশে

ছাড়া হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণীর উপগ্রহগুলি প্রতিপক্ষের সামরিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলিকে চিহ্নিত করে। এগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ইন্‌টেলিজেন্‌স বা সংক্ষেপে 'ইলিন্‌ট' উপগ্রহ। আমেরিকা প্রথম ইলিন্‌ট উপগ্রহ ছাড়ে 1962 সালে। 1972 সালের পর থেকে অবশ্য এগুলিকে আকাশে ছাড়া হচ্ছে 'বিগ বার্ড' উপগ্রহগুলির পিঠে চড়িয়ে। প্রথম রুশ ইলিন্‌ট উপগ্রহ আকাশে ওঠে 1967 সালে ('কসমস 148')।

সবশেষে, চতুর্থ শ্রেণীর গোয়েন্দা উপগ্রহগুলির কাজ হ'ল সাগরের বুকে জাহাজ, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির উপর নজর রাখা। 1971 সালে আমেরিকা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরণের চারটি উপগ্রহ পাঠায়। তারপর 1976 সালে আবার পঠোনো হয় চারটি উপগ্রহ ও তারপর থেকে এগুলিকে নিয়মিত আকাশে ছাড়া হচ্ছে। রাশিয়াও 1967 সালের পর থেকে নিয়মিত পাঠাচ্ছে এই ধরনের উপগ্রহ। এই রুশ উপগ্রহগুলিকে দুই-একমাস কাজ করার পর ভিতরকার মালমশলা সহ 1,000 কিলোমিটার উঁচুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অন্তত কয়েকশ' বছর ধ'রে এগুলির 'গুদামজাত' হয়ে থাকার কথা। কিন্তু 1978-এর জানুয়ারীতে এরই একটি ('কসমস 954') উপগ্রহ তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক উপাদান সহ ভেঙে পড়েছিল কানাডায়। এ নিয়ে হৈ চৈ হ'লে এই ধরনের উপগ্রহ ছাড়া বন্ধ করে রাশিয়া। কিন্তু 1980-র এপ্রিলে 'কসমস 1176 এর মাধ্যমে আবার নতুন ক'রে শুরু হয়েছে এই ধরনের গোয়েন্দা উপগ্রহ ছাড়ার কর্মসূচী।

[সূত্র : সায়েন্স টু ডে মার্চ, 1982, পৃ: 14-20]

1960 সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় 1400 মিলিটারি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, যা মোট সংখ্যার প্রায় 75 শতাংশ। তাছাড়া পারমাণবিক সাবমেরিন বর্তমানে একটি প্রধান সামরিক অস্ত্র। 1960 সালে এরকম সাবমেরিনের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে 250-টির ও বেশী সাবমেরিন টহল দিয়ে বেড়ায়। পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা থেকে যে বিপদ তা বাদেও এ কথা মনে রাখা দরকার যে একটি strategic সাবমেরিনে মজুত নিউক্লিয় অস্ত্র ও SLBM-এ (submarine launched ballistaic missile) সাহায্যে যে কোন দেশকেই ঘায়েল করা সম্ভব। এ বাদেও particle beam weapon, laser killer ray, এরকম বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব অস্ত্রের কথাও প্রায়ই শোনা যায়, যেগুলি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আবদ্ধ। (Chemical ও biological weapon ইতিপূর্বে "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"-র পাতাতেই আলোচিত হয়েছে)।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় তাদের বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল প্রায় 12000 টন TNT। বর্তমান আমেরিকান strategic পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষুদ্রতমটিরই বিস্ফোরণ ক্ষমতা এর প্রায় দ্বিগুণ এবং বৃহত্তমটির প্রায় 6000 গুণ। মোট strategic পারমাণবিক অস্ত্র আছে প্রায় 12000টি এবং এদের সম্মিলিত বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রায় 5000 মিলিয়ন টন TNT। অন্যদিকে রুশ strategic পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় 4600 এবং এদের মোট বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রায় 8000 মিলিয়ন টন TNT। এ বাদেও দুপক্ষের প্রায় 60000 tactical নিউক্লীয় অস্ত্র আছে, যাদের প্রতিটির ক্ষমতা গড়ে হিরোশিমা বোমার প্রায় 4 গুণ। অর্থাৎ, tactical নিউক্লীয় অস্ত্রের মোট বিস্ফোরণ ক্ষমতা হোল প্রায় 3000 মিলিয়ন টন TNT বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের হিসেব বাদ দিয়েও পৃথিবী জুড়ে মোট নিউক্লীয় বিস্ফোরণ ক্ষমতা অতএব দাঁড়াচ্ছে প্রায় 16000 মিলিয়ন টন TNT, অথবা বলা যেতে পারে প্রায় 1,000,000 হিরোশিমা বোমা—অর্থাৎ, মাথাপিছু প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রায় 4 টন TNT! এবং এই পারমাণটি যে ক্রমাগত আরো দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইদানীংকালের সামরিক গবেষণার আরো দুশ্চিন্তাজনক দিক হোল ICBM-এর লক্ষ্যভেদ ক্ষমতার উত্তরোত্তর উন্নতি, অর্থাৎ CEP-র মাত্রার ক্রমাগত হ্রাস। এতদিন পারমাণবিক যুদ্ধ যে কোন শক্তির পক্ষেই ছিল অপরিকল্পনীয়, এবং পারমাণবিক অস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল deterrence, অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করা থেকে শত্রুপক্ষকে বিরত রাখা। কারণ এর প্রত্যুত্তরে আক্রমণকারী নিজেও আবার আক্রান্ত হবে পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা। সুতরাং যে কোন পারমাণবিক যুদ্ধই উভয়পক্ষের নিকটই আত্মহত্যামূলক হতে বাধ্য। সংক্ষেপে এই strategy-কে বলা হয় MAD (Mutually Assured Destruction)। ICBM-এর CEP-র হ্রাস এই মূলনীতিকে বিপর্যস্ত করে—কারণ আক্রমণকারী পক্ষ প্রলুব্ধ হবে প্রথম আক্রমণেই প্রতিপক্ষের ICBM গুলোকে প্রথমে ধ্বংস করে দিতে। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষ হয়ে পড়বে নিরস্ত্র, এবং পারমাণবিক যুদ্ধ আর প্রথম আক্রমণকারীর পক্ষে আত্মহত্যামূলক হবে না। এই চিন্তাধারার বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত হোল পারমাণবিক যুদ্ধ সত্যি সত্যিই সম্ভব, এবং আত্মহত্যা না ক'রে তাতে জয়ী হওয়াও সম্ভব। ইতিমধ্যেই আমেরিকান বিভিন্ন রাজনীতি বিদ্‌দের মুখে শোনা যাচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি। এবং ইউরোপের রাজনীতিতে আজ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) পুনরাবৃত্তি। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষ একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ মানুষের নিকট সবথেকে বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে বাধ্য। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে ঘটনার গতিপ্রকৃতি

এরকমভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক জর্জ কিসিটাকাওস্কি এঁদের একজন। ইনি প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরীতে অর্থাৎ ম্যানহ্যাটান প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন। এক সময়ে উনি ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রধান বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা। অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক উভয় দিক সম্পর্কে এঁকে গণ্য করা হয়ে থাকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ব্যক্তি হিসেবে। কিছুদিন পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে কিসিটাকাওস্কি মন্তব্য করেন[4]: "আমার যা বয়স হয়েছে তাতে আমি হয়ত দেখতে পাবনা, কিন্তু আপনাদের অনেকেই সম্ভবত পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন।"

মনন সেনগুপ্ত
কলিকাতা।

নির্দেশিকা :

1. F. Barnaby : "Physics and the arms race" in *Treads in Physics, 1978* (Proceedings of General Conference of the European Physical Society, held in York, 25-29 September, 1978), Adam Hilger Ltd. Bristol.

2. F. Barnaby : "Military scientists", *The Bulletin of Atomic Scientists*, vol. 37, No. 6 (June/July 1981), p. 11.

3. M. Heylin: "Nuclear arms race gearing speedup" "*Chem & Eng. News*. vol. 59, No. 11 (March 16,1981) p. 26.

4. Interview on Public Policy : "George Kisitakowsky : champion of arms control", *Chem. & Eng. News*, vol. 59 No. 5 (February 2, 1981), p. 20.

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী আঠাশে মে সাহা ইনস্টিটু অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রেক্ষাগৃহে বিকাল তিনটেয়। সভার শেষে প্যারাসাইকোলজি প্রসঙ্গে প্রদর্শনী ও বক্তৃতা দেবেন শ্রী সুবীর ধর।

সংবাদ ঃ সাহা ইনষ্টিট্যুট কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সভা

গত 18 ই মার্চ, 1982 সাহা ইনস্টিটুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এম্প্লয়িজ ইউনিয়নের 14-তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়নের 1981 সালের কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী কার্যকরী সমিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গত কয়েক বছর ধরে সাহা ইনস্টিটুটের পরিচালনব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবী নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, কর্মচারী সমিতি তার অন্যতম অংশীদার। নতুন বছরের জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রী এস কে ব্যানার্জি, দুর্দান্ত রায়, জয়ন্ত দাসগুপ্ত ও জগৎজিৎ মুখার্জি।

বিতর্কমঞ্চ ঃ হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত? হ্যানিম্যানের বক্তব্যে বিজ্ঞান-গ্রাহ্য কিছু আছে কি? হোমিওপ্যাথির সদৃশবিধান ও ডাইলিউশন তত্ত্ব কি বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হয়? এসব প্রশ্ন আজকের নয়, বহুদিনের বিতর্কের বিষয় হ'য়ে রয়েছে এগুলি। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র (বি-ও-বি) পাতায় এগুলির উপর বক্তব্য রেখেছিলেন মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (জুলাই-আগস্ট 1981)। তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে কয়েকটি চিঠি আর হোমিও প্রসঙ্গে শ্রী মজুমদারের আরো পূর্ণাঙ্গ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল বি-ও-বি'র জানু-ফেব্রু 1982 সংখ্যায়। এর পর আবার হোমিও প্রসঙ্গে আরো অনেকগুলি চিঠি এসেছে বি-ও-বি'র দপ্তরে। বেশ কয়েকটি চিঠি অত্যন্ত দীর্ঘ, এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মত। সবগুলি চিঠি পুরো প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পুনরাবৃত্তি ও ব্যক্তিগত কিছু কটাক্ষ তথা আক্রমণ বাদ দিয়ে চিঠিগুলির মূল কিছু কিছু অংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি। আমাদের বোঝার অসম্পূর্ণতার জন্য এবং পত্রিকার স্বল্প পরিসরের জন্য যদি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তবে পত্রলেখকদের কাছে আমন্ত্রণ রইল হোমিওপ্যাথির উপর পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আয়োজিত আগামী আলোচনাচক্রে তাঁদের সে বক্তব্য উপস্থিত করার।

* * * * * *

অমিতাভ দাসের (টেকনোলজি হল, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা) অভিমত: "...রোগ সারা সম্বন্ধে হ্যানিম্যান যে সদৃশ পদ্ধতির কথা বলেছেন, লেখকের (মণীন্দ্রবাবু) মতে তা একটি hypothesis মাত্র। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতম শাখা পদার্থবিদ্যাতে আমরা এরকম অনেক hypothesis ই পাই। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের একটি hypothesis, যা কোন পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়। কিন্তু ঐ hypothesis কে অসাধারণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন আইনস্টাইন। সেটাই বড় কথা। নিউটনের যে তিনটি সূত্রের সাথে আমরা পরিচিত, সেগুলোও আসলে কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি। আসলে এগুলোও hypothesis, কিন্তু এত obvious যে এদের law হিসাবেই গণ্য করা হয়..."

অশোক রুদ্র (শান্তিনিকেতন) বলেন—"...তাঁর (শ্রী মজুমদারের) দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক বিজ্ঞানের মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী...।"

কারণ, (1) "হোমিওপ্যাথির মূল্যায়নে শাস্ত্র ধরে অগ্রসর হওয়া একেবারেই ভুল। ...কোন প্রক্রিয়ায় কোন বিশেষ ফল দেয় কি না, তা বিচার করার একমাত্র উপায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা, controlled experiment..."

(2) "...সাধারণ বহুলোক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে হোমিও চিকিৎসায় অসুখ সারছে। কবিরাজী ওষুধে অসুখ সারছে। আকুপাংচারে রোগ নিরাময় হচ্ছে। যোগব্যায়ামে শরীরের উন্নতি হচ্ছে। ...শ্রী মজুমদার অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করলে শুধু হোমিওপ্যাথি নয় (এই সব কিছুকেই উড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এদের সম্পর্কিত যে যে সব তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেগুলি প্রায়শই আজকের দিনের বিজ্ঞানের পটভূমিকায় গ্রহণযোগ্য নয়।..."

(3) "বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মূল লক্ষণই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়া।..."

(4) "দুনিয়ার অধিকাংশ লোক হোমিওপ্যাথি গ্রহণ করেনি অতএব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ সারে না- এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক নয়। ...চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ধারা বলবান একমাত্র তাকেই বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হবে, অন্য সব কিছুকেই অপমানকর উক্তি সহকারে উড়িয়ে দেওয়া হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিকভাবে বিজ্ঞান-বিরোধী।"

শঙ্কর বিশ্বাস (কলকাতা-85): "হোমিওপ্যাথির অবৈজ্ঞানিক রূপটি সাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য লেখককে সাধুবাদ" জানিয়ে বলেন—"...30 ডাইলিউশনে গোড়ায় নেওয়া ঔষধ (যদি) 10^{33} গুণ কমে যায়, (তবে) বিস্ময়ের বিষয়- কাজ (যদি আদৌ হয়) হয় তবে কিসে—ঔষধে না অ্যালকোহলে না মনের জোরে?...

(a)...শ্রীআহমেদ এর চিঠির (বি-ও-বি, জানু ফেব্রু 1982) উপর ...বলি—শিশুর কোন সুগঠিত মন নেই সত্য, কিন্তু তা বলে পিতামাতার মনের বিশ্বাসেও রোগ সারে না—সারে শিশুর আপন শক্তিতে বা প্রাকৃতিক কারণে,...এখনও এই শহর কলকাতাতেই জলপড়া, নুনপড়া, তেলপড়া,...ইত্যাদির প্রচলন আছে। এবং বেশীর ভাগটাই শিশু-রোগের ক্ষেত্রে। ...এতে কিন্তু ভাল হয়...এবং যে চিকিৎসায় ভাল হয় তাই বৈজ্ঞানিক—তাহলে তো জলপড়া নুনপড়া সবই বৈজ্ঞানিক। ... বিষহীন সাপের কামড়ে মৃত্যু অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু সর্পদংশনাতঙ্কে (সর্পাতঙ্কের বদলে লিখলাম) মৃত্যু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ডাঃ নন্দীর

(বি-ও বি,ঐ) (সঙ্গে) ···একমত হতে পারলাম না। স্ট্রেপটো-মাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন···নিজের কথা নিজেই বলবে। ···হোমিও প্যাথিতে কি এমন একটিও ঔষধ আছে যে নিজের কথা এইভাবে নিজে বলতে পারে ? —'ঔষধ যত কম বস্তুগত হবে তত বেশী হবে ক্ষমতা'—গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের হিসাব মত বস্তু কি আদৌ থাকে, সেন্টীসিম্যাল স্কেলে 30 তম পোটেন্সির বেশীতে ? বস্তু কম হ'লে ক্ষমতা বেশী হবে কিন্তু বস্তু অনুপস্থিত হ'লে ?···"

আনিসুর রহমান খুদাবক্স (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) "একটি চাঞ্চল্যকর পরীক্ষা" শীর্ষক চিঠিতে বলছেন "আসলে হোমিওপ্যাথির যে দিকটা প্রায় শূন্য রয়ে গেছে, সেটা স্বীকার করাই ভাল, সেটা হোল ওষুধের সঠিক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব। এটা পরীক্ষিত সত্য···যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সঠিক প্রয়োগে কাজ (action) হয় এবং কাজ যখন হয় তখন তার একটা 'mechanism'-ও আছে, যা নিয়ে দুর্ভাগ্যবশত বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। যাঁরা হোমিওপ্যাথি ওষুধের dilution বা potency তে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা নিজ ইচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে হোমিওপ্যাথিতে পরস্পর ক্ষতিকর (inimical) কিছু ওষুধের শক্তিকৃত যে কোন মাত্রা খেয়ে দেখতে পারেন !! উচ্চ-মাত্রার ঔষুধে তো বস্তুতপক্ষে 'ওষুধ' কিছুই প্রায় থাকে না, কিন্তু এটা পরীক্ষিত সত্য যে inimical ওষুধের প্রয়োগে···দেহের মধ্যে সাংঘাতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমি এবং কতিপয় ছাত্রছাত্রী একটা ছোট্ট পরীক্ষা করি। বর্তমানে পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে গবেষণা-পত্রটি কোনও একটি আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুতির পথে, তাই হুবহু data তুলে দেওয়ায় বাধা আছে। ···অনেক-গুলো ইঁদুরকে X-ray দেওয়া হয় এবং (তাদের এক অংশকে) হোমিও-প্যাথি Arnica Mont 30 মাত্রার ওষুধ খাওয়ানো হয়। তাদের অস্থিমজ্জা (Bone marrow) থেকে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন (aberration) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ···আমাদের পরীক্ষাতে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গেছি এটা দেখে যে ঐ সামান্য মাত্রার Arnica প্রায় 15-25% aberrations protect করে ! এবং শুধু Arnica প্রয়োগে কোনও mutagenic effect ক্রোমোজমের উপর পড়ে না। ...বস্তুতপক্ষে এত কম ওষুধে এত বেশী মাত্রার protection পাওয়া সত্যিই একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবং আমরা আশা করি আমাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলে বিশ্ববিজ্ঞানে একটি নতুন দিকের সূচনা হবে। —আমরা স্বীকার করছি এই protection-এর পিছনে সঠিক 'mechanism' এর ব্যাখ্যা আমাদেরও জানা নেই।"

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (পশ্চিম কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর 24-পরগণা) জানাচ্ছেন, "···যতদূর জানি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থা একটি অভিজ্ঞতাভিত্তি চিকিৎসাব্যবস্থা। এর কোন তত্ত্বগত ভিত্তি আছে বলে জানা নেই যার ফলে অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা ওষুধ কয়েক বৎসর ব্যবহার করার পর তার কুফল ধরা পড়ার পর ঔষধটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ···অপরদিকে সুষ্ঠু তত্ত্বভিত্তিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোন একটি ঔষধ 100 বৎসর পূর্বে যে যে রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হতো আজও সেই রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হয় এমনকি হাজার হাজার বৎসর পরেও উহা একই রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হবে··· এবং ইহার কোন কুফল দেখা যাবে না।···আসুন না (দেখা যাক) ছোটখাট আলোচনার মাধ্যমে কোন চিকিৎসাপদ্ধতি কতটা বৈজ্ঞানিক ···তা নিরূপন করা যায় কি না।

শাশ্বত পাল (ঠিকানা নেই) বি ও বি-'র পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—"আপনাদের জানিয়ে রাখি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি আজ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাদৃত হচ্ছে (যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কখনোই চায়না হোমিওপ্যাথির উন্নতি হোক)। আপনারা দুর্মুখের গুস্তাকি মাফ করবেন কারণ 'সে' মজুমদারবাবুর কিছু ভুল, কিছু স্ববিরোধী বক্তব্যকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চায়।

"···হোমিও-চিকিৎসা কথাটার অর্থ কি ? যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেই হোমিও-চিকিৎসা বলা হয়, তা কি বিজ্ঞানসম্মত ?

"মণীন্দ্রবাবু" বলতে চেয়েছেন 'এ্যালোপ্যাথি' শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞান। প্রমাণস্বরূপে তিনি বলেছেন এ্যালোপাথি হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, ভালো ছাত্রছাত্রীর আকর্ষণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুর্মুখ এবার আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চায়—(ক) কোন দেশে (যে দেশে 75%লোক অশিক্ষিত) বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল যদি পুঁজিপতিদের সাহায্যে (ভোট পুজোর মাধ্যমে) ক্ষমতা দখল করে তাতে কি প্রমাণ হয় যে ঐ বিশেষ দলই সঠিক বা জনপ্রিয় ? পুঁজিবাদী গোষ্ঠি কখনই হোমিওপ্যাথির উন্নতি ঘটাতে রাজী নয়। (খ) ভালো ছাত্রছাত্রীর আকর্ষণ ? ভালো ছাত্রছাত্রী মানে যদি এই হয় যে ভুরি ভুরি নম্বর জোগার করা তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আপনারা কি জানেন, এই সমস্ত তথাকথিত 'এলোপ্যাথিক' কলেজ-গুলোতে কিভাবে ছাত্র ভর্তি হয় ? আর কখনই বা ভালো ছাত্র ভর্তি হয় ? দুর্মুখের অনুরোধ—দয়া করে একটু জানবার চেষ্টা করুন। শ্রীমজুমদার বলছেন 'হোমিও ওষুধে রোগীরা কেমন ভালো হয়, তার কোন বিজ্ঞান-সম্মত পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় না।'···কত পরিসংখ্যান, কেমন ধরনের পরিসংখ্যান আপনারা চান ? তাহলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 1) হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া 2) ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি, 3) আন্ত-র্জাতিক হোমিও লিগ 4) হোমিও সমীক্ষা প্রভৃতি।

"হোমিওপ্যাথি ওষুধ শরীরে প্রয়োগ করার পর সেই ওষুধ শরীরকে 'এ্যান্টিবডি' তৈরীর কৌশল আয়ও করতে সাহায্য করে, আর এভাবেই

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েও জীবাণু, ভাইরাস, ইত্যাদি ধ্বংস করা যায়। এটা কোন কাল্পনিক কথা নয়, পরীক্ষার দ্বারা প্রমানিত।

"মণীন্দ্রনারায়ণবাবু আন্তর্জাতিক একটিও প্রমাণ্য বই বা রচনা পাননি যেখানে হোমিওপ্যাথিকে অপজ্ঞান ও বিভ্রান্ত না বলা হয়েছে।...যে কোন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরীতে চলে আসুন, কত বই পড়তে চান পড়ুন, তারপর সমালোচনা করুন। আরো সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি 'Indian Journal of Homeopathy-র 1980 আগষ্ট সংখ্যা থেকে 'Scientific Basis of Homoeopathy' এই শিরোনামে যে রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছে সেটি পড়ুন, এটি লিখেছেন Dr. R.R. Sharma (Post-graduate Institute of Medical aducation & Research, Chandigarh, Biophysics Department) .....প্রকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করেই হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠিত। হোমিওপ্যাথিকে জানতে হলে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে জানতে হবে। ভাইটাল ফোর্স বা লাইফ্ প্রিন্সিপ্‌ল তত্ত্ব বুঝতে গেলে শক্তি সম্বন্ধে ($E=mc^2$) ধারণা রাখতে হবে, হোমিওপ্যাথির আরোগ্যনীতি বুঝতে হবে। শুধু বিরোধিতা করার জন্যই বিতর্কে অংশগ্রহন করলে বিজ্ঞানকেই অবমাননা করা হবে। সমাজ-জীবনের বিকাশ ঘটাতে গেলে...হোমিও-দর্শন ও হোমিও বিজ্ঞান জানা একান্ত জরুরী।..."

রবি মাইতি (ইনস্টিটিউট ফর ডায়ালেকটিক্যাল স্টাডিজ, চুঁচুড়া) "দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও হোমিওপ্যাথি" শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেন—"...সারা জগৎব্যাপী আজ যে একটি একীভূত আরোগ্যবিজ্ঞান (unified therapeutics) উদ্ভাবনের জন্য বিছিন্ন প্রচেষ্টাগুলির সূত্রপাত ঘটেছে তা কিন্তু অচেতন বা পরোক্ষভাবে হলেও ঐ (পত্রলেখকের পূর্বোল্লিখিত—সঃমঃ) Science of universal interconnection বা দ্বন্দ্ববিজ্ঞান ভিত্তিক আরোগ্য বিজ্ঞান উদ্ভাবনার দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। চণ্ডীগড়ের ডক্টর আর আর শর্মা কর্তৃক 1977-এ প্রকাশিত 'A unified Theoretical Approach to Homoeopathy, Immunology nad Rajayoga and its Consequences' নামক প্রবন্ধটি এ সম্বন্ধীয় একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। ...

"হ্যানিম্যান পরীক্ষিত.. তত্ত্বের দ্বান্দিক বা দার্শনিক ভিত্তি হল 'Organon of Medicine' গ্রন্থের মোট 293 টি সূত্রের মধ্যে 15 নং ও 16 নং সূত্র দুটি এবং ঐ গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূকার অন্তর্গত আর একটি অনুচ্ছেদ। যে organism বা দেহমধ্যে রোগোৎপত্তি ঘটে থাকে, হ্যানিম্যান তাঁর গ্রন্থ-ভূমিকায় তাকে 'spiritual corporeal organism' হিসাবে আখ্যাত করেছেন। অর্থাৎ organism হল তার ভর-কাঠামোগত corporeal রূপ এবং তেজক্রিয়াগত spiritual স্বরূপ– এই অবিচ্ছেদ্য দুটি বিপরীত তত্ত্বের একটি একীভূত সত্তাবিশেষ।

"হ্যানিম্যান অনুগামীদের মধ্যে বোধয় সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন জে. টি. কেন্ট। তিনি তাঁর **Lectures on Homoeopathic Philosophy'**র মধ্যে **organon**-এর সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 13 ও 14 নং সূত্রের ব্যাখ্যার পর 15 নং সূত্রের পৃথক ব্যাখ্যা না দিয়ে ঐ 14 নং সূত্রমধ্যেই কোন রকমে দু একটি কথা বলে তা ছেড়ে দিয়েছেন, দেহ ও প্রাণশক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কগত (15 নং সূত্রের) দ্বান্দিক তাৎপর্যের ধারেকাছেও যাননি। 16 নং সূত্র সম্বন্ধেও তাঁর যে ব্যাখ্যা তাও হ্যানিম্যানের বস্তুতথ্যভিত্তক আলোচনার ধারে কাছে যায় নি। তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি হ্যানিম্যানের **'Spirit like power'** যেভাবে তাঁর নিজস্ব **'simple substance'**-এর তত্ত্ব দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত বা অচ্ছন্ন রেখে ঐশ্বরিক শক্তির মাহত্ম্য প্রদর্শন করেছেন, তাতে বক্তৃতাটিকে...'Kent's philosophy on Homoeopathy' বলাই বোধ হয় অধিকতর সংগত।...

"হ্যানিম্যান জীবনীশক্তিকে কোথাও **vital force**, কোথাও **vital energy** কোথাও আবার **vital principle** বলে উল্লেখ করেছেন।

...তিনি যখন এই **energy** কথাটি ব্যবহার করেছেন, তখন **mass-conversion into enegy** কিংবা **energy-conversion into mass**-এ ব্যাপারগুলি মানুষের পক্ষে প্রায় একেবারেই অকল্পনীয় ছিল। তবুও এক অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি এই **energy** কে একেবারে নিঃসন্দেহে ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট **'spirit'** বানিয়ে ছাড়েন নি, বলেছেন **spirit-like something**, এবং **spirit like**-এর পরেও বন্ধনীবদ্ধ **dynamic** বা **conceptual**। আর আমরা আগেই দেখেছি তাঁর **organism** সম্বন্ধীয় **concept** এর মধ্যে **spiritaality** এবং **corporeality** অর্থাৎ **energy-dominant something** এর সঙ্গে **mass dominant something** একেবারে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে, এবং এভাবে **mass-energy conversion theory** আবিষ্কৃত হওয়ার প্রায় একশ বছর আগেই **dialectic of matter or nature** তাঁর মানস নেত্রে প্রতিফলিত হতে চেয়েছে।...

"..কোন ঔষধ বা রাসায়নিক স্থূলভাবে অনুভূত ভৌত প্রণালীতে বিক্রিয়া ঘটাতে না পারলে যে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা বোধয় ঠিক নয়। অর্থাৎ এক বিশেষ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত না হলেও তার সমর্থন সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয় না। ...(এইভাবে) হ্যানিম্যানের ধারণাকে দ্বন্দ তত্ত্বনির্ভর সুতরাং বৈজ্ঞানিক না বলে উপায় থাকে না।..."

অমল কুমার ভট্টাচার্য ও রঞ্জিত শূরের (151, ডায়মণ্ড-হারবার রোড, কলিকাতা-34) কিছু বক্তব্য :—"আমাদের 1 থেকে 294 পর্যন্ত সূত্র আছে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে ধরা যায় না,...প্রতিটি সূত্রের সাথে একটা সংযোগ আছে, সেই কারণে মাঝখান থেকে একটা সূত্র তুলে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞাসসম্মত কি না বা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত বোঝাতে

খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। Nosode group of Medicine-এর pathogenic property থাকে বলে তারা antibody-ও দেহে তৈরী করতে পারে। এটা ইমিউনোলজিকে ছাড়িয়ে যায় নি।…আমরা হোমিওপ্যাথরা বলতে পারি যে আমরা। (1) রোগ সারাতে পারি (2) রোগ প্রতিরোধ করতে পারি এবং (3) রোগের উপশম করতে পারি। যে চিকিৎসা বিধানে এই তিনটি সম্ভব সেটি যথার্থ চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয় কি ?…

বাস্তব প্রয়োগে হোমিওপ্যাথির সাফল্যের অনেক ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা তুলে ধরছি—

ক) একজন রোগী কলিকাতা মেডিকেল কলেজের Cardiology dept. এ চিকিৎসার জন্য যায় এবং Septal disorder of heart ধরা পড়ে এবং রোগীকে ভেলর পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তিনমাস পর দিন ধার্য হয়। ইতিমধ্যে রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে যায় এবং কিছুদিন পর সেই কলেজেরই ডাক্তারই বলেন যে রোগীর ভেলর যাবার প্রয়োজনীয়তা নেই।

খ) সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছেই একজন রোগী ব্রেন টিউমার নিয়ে যায় X-ray report সহ। টিউমারটি ডানদিকে সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ারে ছিল এবং কিছুদিন চিকিৎসা করার পর পুনরায় X-ray report-এ টিউমারটির আর কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না [সংশয় থাকলে আমরা সব তথ্য তুলে ধরতে সক্ষম]। "…হ্যানিম্যান দেহ ও আত্মার কথা বলেন নি, তার আলোচনা সূত্র 9-এ হ্যানিম্যান বিশদ-ভাবেই বলেছেন। সাইকোসোমাটিক এই ব্যাপারটায় কারো যদি পরিষ্কারভাবে ধারনা না থাকে তাহ'লে কিছু বলবার নেই। কারণ হোমিওপ্যাথিতে মানসিক এবং দৈহিক সমতাকেই স্বাস্থ্য বলা হ'য়েছে এবং এই শাস্ত্রে মনের ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ দৈহিক লক্ষণ মনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।…

"…বিপরীত বিধানে রোগ সারে না এটা বুঝে নেওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, কারণ Newton বলেছেন—'Every action has equal and opposite reaction'…Similia similibus curentur বলতে গিয়ে Isopathy'র সাথে কেউ যদি হোমিওপ্যাথিকে গুলিয়ে ফেলেন তাহ'লে কিছু বলবার নেই। হ্যানিম্যান অর্গাননের কোথাও বলেননি যে পুড়ে গেলে আগুন লাগাতে হবে বা ধুতরা যেহেতু উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে সুতরাং উন্মাদ মানেই Stramonium (ধুতরা থেকে তৈরী ঔষধ)।…বস্তুকে কতদূর পর্যন্ত ভাঙ্গা যায়, তার কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়, …সুতরাং যতই…ডাইলুশন করা হোক না কেন এটা বলা যাবে না যে তাতে কিছু নেই বা তার মধ্যে কোন শক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। —complete ionization and absolute dissociation are possible only in infinite dilution এবং dilute করা ঔষধ যে রোগীর রোগ দূর করে তা বাস্তবে প্রমাণিত হাজার হাজার হোমিওপ্যাথদের দ্বারা।…

"Magnetis polus arcticus বা Sanicula ইত্যাদি যে ঔষধগুলি মজাদার ব্যাপার নিশ্চয়ই তবে অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়। কারণ এগুলি প্রত্যেকটি ঔষধ…পৃথক লক্ষণসমষ্টি সুস্থ দেহে দিয়ে থাকে।…ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিতে হ্যানিম্যানের বিশ্বাস ছিল বলে তত্ত্ব কখনো অবৈজ্ঞানিক হয় না। তাহ'লে Sir Isaac Newton-কেও তাই বলতে হয়। …বর্তমান বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারছে না বলে তাকে অস্বীকার করতে পারি না, কারণ রোগীর ক্ষেত্রে তা দেখতে পাচ্ছি।…"

জ্যোৎস্নাময় মুখার্জী (পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলি-9) অধ্যাপক Traube কে (1925) সাক্ষী মেনে বলেন, "…ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া বস্তুর কলয়েড অবস্থানজনিত গুণের উপর নির্ভরশীল। —(এই) অবস্থায় বস্তু ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। তিনি (Traube) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ অবস্থায় বস্তু জৈব বিদ্যুৎ প্রভব (Bio-electrical potential) হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া জৈব প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।…

" সেন্টেসিম্যাল স্কেলে হ্যানিম্যান 30 ডাইলিউশন পর্যন্ত গিয়েছেন। গোড়ায় নেওয়া ঔষধ এই পর্যায়ে 10^{33} গুণ কমে যায়'—তাঁহার (শ্রী মজুমদারের) হিসাব ভ্রান্ত। 30 শক্তির হোমিওপ্যাথিক ঔষধে গুণোত্তর শ্রেণীর সূত্র প্রয়োগ করিয়া দেখান যায় যে ঐ শক্তিতে মাত্র এক গ্রেণের 10^{60} অংশ পরিমাণ ঔষধদ্রব্য বর্তমান থাকা উচিৎ…। …নির্বিচারে গুণোত্তর শ্রেণীর প্রয়োগ অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প লঙ্ঘনের…অমূলক দোষারোপের শিকার হইয়াছে।

"লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে একটি সংবিভাগ সূত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, (যাহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে)—ঔষধের শক্তিক্রিয়তা যে কোন পরিমাণ ঊর্দ্ধে আরয়ন করা হউক না কেন সেই ঔষধে ঔষধদ্রব্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিশ্চিত…

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার মূল ক্রিয়া এইরূপ। পর্য্যায়-ক্রমে ঔষধের শক্তিক্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে ঔষধদ্রব্যের লঘুতা দশমিক মাত্রায় 1/10, শতমিক মাত্রায় 1/100 এবং মিলিসিমেল মাত্রায় 1/50,000 এই অনুপাতে হ্রাস করিতে হইবে এবং প্রতি পর্যায়ে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার তরল মাধ্যম সমেত ঔষধদ্রব্যকে ঝাঁকাইতে হইবে। …ঝাঁকুনি কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর একটি বিশেষ অঙ্গ—ইহা হয়ত অনেকের নিকটই দুজ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইবে। …কিন্তু Rudolph B Smith, M. D এবং Garth W Boericke, M. D. (J. American Inst. Hom., Vol-60, No. 9-10, (1967) p-259-72) LiCl-এর বিভিন্ন অ্যালকোহলীয় দ্রবণের (6x হইতে 30x পর্যন্ত)

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) দ্বারা দেখাইয়াছেন যে (ঝাঁকুনিযুক্ত)···পোটেন্সির অনুনাদী লেখচিত্রের ক্ষেত্রফল, সরল দ্রবণের ক্ষেত্রফল হইতে বেশী।···

কল্যাণ দেব (রামমোহন কলেজ, খানাকুল, হুগলী) বি. ও. বি জানু-ফেব্রু 1982'র বিতর্ক মঞ্চে 'কয়েকটা দুর্বল যুক্তির প্রতিবাদ' জানাতে চেয়েছেন। "···হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোন এম্পিরিক্যাল এতে বিভাসবাবুর আপত্তি কেন? এম্পিরিক্যাল-এর অর্থ বিজ্ঞানবিরোধী নয়। উপরন্তু একমাত্র এম্পিরিক্যাল পরীক্ষাই বলে দিতে পারে হোমিওপ্যাথি ধোঁকা কি না।···

".. আমি নিজে হোমিও চিকিৎসায় প্রচণ্ড সুফল পেয়েছি। লঘু ও তেজীকরণের ব্যাপার নিয়ে একটা wild guess করেছিলাম। আর্সেনিককে যখন 99 গুণ মিল্ক অফ সুগারের সঙ্গে ঘষা হয় তখন এমন হওয়া কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে মিল্ক অফ সুগারে উপস্থিত জীবাণুর মধ্যে আর্সেনিক রেজিস্ট্যান্স তৈরী হয়। এইভাবে চলে। ঐ ওষুধ মানুষের দেহে গেলে ঐ R-factor মানুষের দেহের প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

অথবা এমনও হতে পারে যে মিল্ক অফ সুগারের ক্রিস্ট্যাল গঠনে আর্সেনিকের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক কোন পরিবর্তন ঘটে। হতে পারে?"

সুদর্শন চক্রবর্তীর (টেলিফোন ভবন, সপ্তম তল, কলিকাতা 1) বক্তব্য কিন্তু ভিন্ন :

"···একটিতে পাই কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার উপর আস্থা, আর অন্যটিতে (হোমিওপ্যাথিতে) পাই বেশী জানার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার উপদেশ "...there are things the human hand has not grasped, human eye not yet seen, the human mind, yet, not comprohended—perhaps we shall never palpate these essential life forces." (p—148, 'The Homoeopathic Principle in therapeutics—T. H. McGavack Head of the Dept. of Homoeopathy. Univ. of California Medical School)। দ্বিতীয় মতটি নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক।

এই অবৈজ্ঞানিক মতবাদের ছত্রছায়ায় নানা আজগুবি তত্ত্বের ছত্রাক লালিত পালিত হয়েছে। ···এই আলোচনার বর্শামুখ···শুধু Dilution theory'র উপর রাখা হচ্ছে।

Dilution তত্ত্বের উপর Homoeopathic circle-এ নানা মুনির নানা মত। এই···বর্ণালীর কিছু আভাষ দেওয়া যাক –

Krakow (1922) দেখিয়েছেন যে এড্রিনালিন, মার্কারি বাইক্লোরাইড, কপার সালফেট 24x-এ কাজ করে; সিলভার নাইট্রেট হিস্টামিন···32x-এও কাজ করে। Kolisco দেখেছেন লোহা ও তামার সল্ট গমের Germ-এর উপর 30x-এ কাজ করতে পারে—এসব ব্যাপারে McGavaet মন্তব্য করেছেন যে উপরের dilution গুলো খুবই সন্দেহজনক, কারণ— ···একটা কাঁচের পাত্রে 1/100 মেথিলীন ব্লু-কে 200x ডাইলিউশন করলে এবং ঐ কাঁচের পাত্রে solution-টিকে কয়েকঘণ্টা রাখলে কাঁচের পাত্রের গা থেকে Methylene Blue Solution-এ যাবে। তাই Theoretical dilution 200x হ'লেও actual dilution হবে 4x বা 5x। তাই extreme dilution-এও (এই) oligo-dynamic effect এর জন্য কিছু পদার্থ থেকে যায়।

"এবার ভারতীয় হোমিওপ্যাথ Dr. Bihari কি বলেন দেখা যাক— ···'Homoepaths have found out that in the actual practice the real molecules are different from the cenceived physicists' molecules' (p. 44, 'Unfathomed Regions of Homoeopathy')—যুক্তির লাগাম ছাড়া ঘোড়া ছুটেছে—বিবি ছাড়া আমরাও একটু সরে দাঁড়াই, দেখি কি হয়!

"কিছু Homoeopath dilution এর তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে Einstein এর $E=mc^2$ টেনে আনেন ..Higher dilution এ···নাকি.. mass energy-তে converted হয়। ...mass যে energy তে converted হয় ত আমরা জানি—এই conversion আমরা প্রত্যক্ষ করি chemical combustion-এর বেলায় বা Nuclear fission-এর বেলায়। কিন্তু dilution কার মধ্যে তো আমরা এমন কিছু process প্রত্যক্ষ করি না... তাই Homoeopath দের এই প্রচেষ্টাও 'ছায়া ধরার ব্যবসা' হ'য়ে রইলো।

Dr. D. S. Rawson (British Homoeopathic Journal, Apr. 1972) potentised ওষুধের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে Semiconductor Theory'র শরণাপন্ন হয়েছেন।

...(কিন্তু) physics এ semiconductor তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা আছে ... potentised drug এ stored energy (Rawson এর ভাষ্য অনুযায়ী) কোথা থেকে আসে? তার physico-chemical explanation কি?

"তত্ত্বের এই গড়মিলের প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই পড়ে practising Homeopath-দের dilution এর প্রতিবিধানে। যেমন—ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে—ঠিক ঔষধ হলে তা যে কোন potency তে কাজ করবে। Dr. Von dor Goltz কিন্তু···low potency র যথার্থতা সম্বন্ধে একমত নন। Dr. Wheeler···Higher polincy দিয়েই আরে ভাল করে সারানো যায়, তবে কিছু জায়গায় low potency কাজ করে। ...Dr. Ellin Barker—potency পরিবর্তিত করে যেতে হবে 9x থেকে 12x তারপর 30x, আবার 30x থেকে 12x এবং 6x, তারপর 30x, তারপর 200x! Dr. Farrington—Asthma তে

lower potency সবচেয়ে ভাল ; Dr. Vondor Goolz—Asthma তে 200th থেকে 1000th single dose দিলে cured হয়।..."

জানু-ফেব্রু 1982 সংখ্যার পত্রলেখক **টি আহমেদ** এর আরো কিছু বলার আছে : "...Only antigens are not sufficient to produce disease। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না vital force—weak হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ Antigen এর introduction কিছু করতে পারছে না। তাই যথার্থভাবেই হ্যানিম্যান বলেছেন কোন বস্তু (বিভিন্ন ধরণের antigen) কোন কটু তা, অসুখ ঘটানোর কোন জিনিষে কোন মানুষের অসুখ হয় না।

"ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করে অবৈজ্ঞানিক কিছু তো পেলাম না। তাহলে ব্যঙ্গ করে (হ্যানিম্যানের) এ উদ্ধৃতি দেওয়ার কি অর্থ হয় ? ..."

* * * *

অনেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, হোমিওপ্যাথি বিষয়ে **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর সম্পাদকমণ্ডলী** বা **পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার অভিমত কি ?** পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা সকল স্তরের বিজ্ঞান-কর্মীর ভিতর ব্যাপক ও লাগাতার আলোচনা-সমালোচনার **প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই** একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছতে চায় ; এই প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে **স্বতন্ত্র** কোন অভিমত গঠন করা বা আঁকড়ে থাকা সংস্থার উদ্দেশ্য নয়। বি-ও-বি তে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, আগামী আলোচনাচক্রের মধ্যে দিয়ে তা থেকে একটি মতামত গঠনের দিকে এগোতে চায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা। তবে এই মতামত গঠনের প্রক্রিয়াটি যাতে কার্যকর হতে পারে তার জন্য কয়েকটি বিষয়ে আগাম স্বীকৃতি প্রয়োজন। বি-ও-বি তে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে আমাদের মনে হয়েছে নিচের স্বীকৃতিগুলি থেকে আমাদের পরবর্তী আলোচনা শুরু করা দরকার।

(ক) অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথ বা অন্য কোন নির্দিষ্ট 'প্যাথির' শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ নয়, একটি একীভূত চিকিৎসাবিজ্ঞান (unified medical science)-এর লক্ষ্যে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে। এই একীভূত চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপাদান কি কি হবে সেটি নির্দ্ধারণ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

(খ) সমস্ত আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে নিতে হবে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির** প্রশ্নটিকে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করে **যাচাই করা যায়** এমন ধরনের **পরীক্ষা-নিরীক্ষা**, এবং **তত্ত্বগত বিশ্লেষণ** এই দুয়ের পরস্পর পরিপূরক সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দু'টির কোন একটিকে বাদ দিয়ে যে ব্যবস্থাই গড়ে উঠুক না কেন তা অবৈজ্ঞানিক। তবে অবৈজ্ঞানিক মানেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়। তার ভিতর থেকে গ্রহনীয় উপাদনগুলিকে সনাক্ত করা প্রয়োজন।

(গ) 'হোমিওপ্যাথি কাজ করে', বহুসংখ্যক মানুষের এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। ঠিক কোন কোন ওষুধ কোন কোন অসুখে বা অবস্থায় কি ধরনের কাজ করে সে সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ বিশদ **তথ্যাদি** প্রয়োজন ও তা বারংবার **যাচাই** হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের স্তরে লব্ধ অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক হোক না কেন তা একটি প্রাথমিক দিকনির্দেশের বেশী আর কিছুই দিতে পারে না।

(ঘ) বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ওষুধগুলি **কেন** কাজ করে সে সংক্রান্ত তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণ যতই বিশদ ও ব্যাপক হোক না কেন, সঠিক তত্ত্ব ছাড়া তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও চিকিৎসাপদ্ধতির ক্রমিক উন্নতি কোন মতেই সম্ভব নয়।

(ঙ) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নিয়মাবলী এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে না। যেমন, অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প এক ক্ষেত্রে খাটবে আর এক ক্ষেত্রে খাটবে না এমন হওয়া সম্ভব নয় : যদি দেখা যায় এমন হচ্ছে তবে বুঝতে হবে হয় পর্যবেক্ষণে ভুল আছে আর না হয় অ্যাভাগাড্রো প্রকল্পকে আরো উপযুক্ত কোনো সূত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পর সঙ্গতিহীন নিয়মাবলীর অস্তিত্ব স্বীকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

(চ) তত্ত্বগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি **সম্ভাবনা** চিহ্নিত করা বা বৈজ্ঞানিক অর্থ-সম্বলিত কয়েকটি বক্তব্য আলগাভাবে উপস্থিত করার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কিছু সম্ভাবনা চিহ্নিত করা থেকে একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ শুরু হতে পারে মাত্র, কিন্তু শুধু সম্ভাবনা চিহ্নিত করাকেই তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বা তার একটি ধাপ ব'লে ধ'রে নিলে চলবে না। ভর ও শক্তির সমতুল্যতা বা $E=mc^2$ সূত্রটি হোমিওপ্যাথিতে প্রযোজ্য হতে পারে শুধু এ কথ বললে তা হোমিওপ্যাথির তত্ত্বগত বিশ্লেষণে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে না। $E=mc^2$ সূত্রটি একটি **বিশদ তত্ত্বগত কাঠামোর** অঙ্গ। **প্রচুর** তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে এই কাঠামোটি তৈরী। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে এই কাঠামোটি কিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সে সম্ভাবনাটি চিহ্নিত না করলে শুধু $E=mc^2$ সূত্রটি উল্লেখ করা আর কোনো একটি তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করা একই ব্যাপার। বিপরীত বিধানের অসারতা বোঝাতে সূত্রগুলিকে তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ, অথবা নিউটনের নিউটনের **'obvious hypothesis'** বলা এগুলিও এমনই আলগা বক্তব্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অবান্তর, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ভুলও।

(ছ) আজ যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, কাল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, অথবা ব্যাখ্যা না পেলেই কোন কিছু বর্জনীয় হ'য়ে যায় না. **এই** সঠিক বক্তব্য থেকে, আজ যার ব্যাখ্যা পাওয়া

যাচ্ছে না সে রকম সবকিছুকে স্বীকৃতি দেওয়াটাও আবার বিপরীত ধরণের ভ্রান্ত মানসিকতা। সঠিক পর্যবেক্ষণ ও সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই থাকে কোনো পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির একমাত্র গ্যারান্টি।

হোমিওপ্যাথির ভিতর যদি কিছু গ্রহণযোগ্য থাকে তবে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা সনাক্ত করার ও একীভূত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়া যত ত্বরান্বিত করা যায় ততই মঙ্গল।

সম্পাদকমণ্ডলী
বিজ্ঞান-ও-বিজ্ঞানকর্মী

'বিজ্ঞানের নিরীখে হোমিওপ্যাথি' এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিকাল গ্রাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি আলোচনাচক্রের অয়োজন করেছে আগামী 5 ই জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসী বিভাগে বিকাল 5 টায়।

এ বিষয়ে আগ্রহী সকলকে এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গে আপাতত আর কোন চিঠিপত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে প্রকাশিত হবে না।

রিপোর্ট

চিত্তরঞ্জনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মার্চের 26 থেকে 28 রেল নগর চিত্তরঞ্জনে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় ক্লাব সবুজ সংঘ। রকমারি মডেল নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের 'আমরা কজন' আর বাইরের ক'টি বিজ্ঞান ক্লাব (গোবরডাঙা যুব বিজ্ঞান সংঘ; জগদীশ চন্দ্র বসু ক্লাব, কলকাতা; সপ্তর্ষি ক্লাব, কলকাতা ইত্যাদি)। মডেলগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য বা নতুনত্বের স্বাদ অবশ্য খুব বেশী ছিল না। তবে সমসাময়িক সমস্যায় আগ্রহের নমুনা হিসেবে ছিল সৌরশক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত একাধিক মডেল। আর বিজ্ঞানের মানবিক প্রয়োগের একটি ছোট্ট অথচ উজ্জ্বল নজির হিসেবে জ্বলজ্বল করছিল "অন্ধের যষ্টি" (blind man's stick) —যার উদ্দেশ্য একজন দৃষ্টিহীনকে পথের জলকাদা সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া।

প্রবেশপথের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা ছিল "Through Science to a better Society"। সেই সঙ্গে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে সাজানো অনেকগুলি পোষ্টারের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে ফুটে উঠেছিল সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের একাংশের চিন্তাভাবনা। যেমন, "বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রের নয়, বিজ্ঞান আপনার আমার সবার", "হাঁচি, পঞ্জিকা, টিকটিকি প্রভৃতিতে অন্ধ বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দুর্বলতার উৎস—মেঘনাদ সাহা" ইত্যাদি।

সবচেয়ে চোখে পড়ে প্রদর্শনী সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ। প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভীড় আর বাইরে অপেক্ষমান মানুষের দীর্ঘ লাইন বোম্বাই মার্কা অপসংস্কৃতিকে পরাজিত করার একটি সম্ভাব্য পথের ইঙ্গিত রাখছিল বারে বারে। দশ-বিশটি মডেল সাজানোর সাথে সাথে এই আগ্রহী মানুষদের বিজ্ঞান-আন্দোলনের আরো সক্রিয় শরীক করার ব্যবস্থা করা যায় কি?

চিঠিপত্র

হেলে সাপের জন্মকালীন দৈর্ঘ্য

1981 সালের 22শে অক্টোবরের সকালবেলা। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হরেন্দ্রনগর গ্রামের জনৈক চাষী এক পুকুরের ধারে ঘাস কাটতে কাটতে হঠাৎ পাঁচটা ডিম পেয়ে যান। ডিমগুলো পেয়ে কৌতূহলবশত তিনি নিজেই চারটে ডিম ভেঙ্গে ফেলেন। ডিম ভাঙ্গতেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে চারটে সাপের ভ্রূণ (embryo)। চাষীভাইটি জানতেন সাপের প্রতি আমার একটু কৌতূহল আছে। তাই তিনি ভ্রূণ সমেত বাকী ডিমটি আমার কাছে নিয়ে আসেন দেখানোর জন্য। আমি দেখলাম এগুলো হেলে সাপের (Stripped Keel Back) ভ্রূণ এবং প্রত্যেকটিই পূর্ণবর্ধিত (fully matured)। শেষমেষ বাকী ডিমটা আমি নিজেই ভাঙ্গলাম—যথারীতি পূর্ণবর্ধিত আর একটি ভ্রূণও পেলাম।

রম্যুলাস হুইটেকার (1978) তার বইয়েতে হেলে সাপের জন্মকালীন দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে লিখেছেন—এরা গড়ে 9 সেমিঃ দৈর্ঘ্যের হয়। কিন্তু আমি যে হেলে সাপগুলো পেয়েছিলাম তাঁদের জন্মকালীন দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ—

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য	লিঙ্গ
1	16 সেমিঃ	পুং
2	16 সেমিঃ	পুং
3	16 সেমিঃ	পুং
4	16.5 সেমিঃ	পুং
5	16 5 সেমিঃ	স্ত্রী

গড় দৈর্ঘ্য—16.4 সেমিঃ।

আমার মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক (adult) হেলে সাপগুলোও দৈর্ঘ্যে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বড়ই হবে। আর এর জন্য নিশ্চয়ই সুন্দরবনের পরিবেশই পরিপূর্ণভাবে দায়ী।

বিকাশ কান্তি সাহা, প্রযত্নে-ডাঃ শান্তি গোপাল সাহা, রায়দীঘি রুর‍্যাল হস্পিটাল, পোঃ-রায়দীঘি. জেলা-24 পরগনা।

পরিক্রমা

দূষিত রক্ত। রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রক্তের সরবরাহ এদেশে অত্যন্ত কম। তাও আবার বেশীর ভাগই আসে পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে যাঁদের শরীরের নানাবিধ রোগ এই রক্তের মাধ্যমে গ্রহীতাদের দেহে সঞ্চারিত হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, 102 জন পেশাদার রক্তদাতার ভিতর 85 জন মদ্যপ, এবং আরো পাঁচজন মদ ও গাঁজা দুইয়েই আসক্ত। অনেকে দারিদ্র্যের কারণে ঘন ঘন রক্তদান করেন বলে তাঁদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের অনুপাত অত্যন্ত কম। কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্ক বছরে যোগাড় করে মাত্র 60 হাজার বোতল রক্ত, যেখানে চাহিদার মাত্রা দেড় লক্ষ বোতল। এই পরিস্থিতিতে রক্ত-দানের ব্যাপারে নানারকম জঘন্য অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপও যথেষ্ট ব্যাপক। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গিয়েছিল বারাসতের এক কিশোরকে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করে তার শরীরের রক্ত টেনে বার ক'রে নেয়। কেবল সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সে যাত্রা কিশোরটি দুর্বৃত্তদের কবল থেকে ফিরে আসে। আমরা জানতে পাই এ সমাজে কি ঘটে। জেনে অসহায় বোধ করি...।

(সূত্র : স্টেট্‌সম্যান, 26 2 82 ; প্রগতিবার্তা (কল্যানী), চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, 1 সেপ্টেম্বর, 1980)

মেকী ওষুধ : সরকারের কিছুই বলার নেই। গত 30শে মার্চ লোকসভায় বেশ কিছু সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রশ্ন রাখেন। তার কয়েকদিন আগেই (24 মার্চ, 1982) দিল্লীতে জাল ওষুধ তৈরীর এক বিরাট কারবার ধরা পড়ে। তারও আগে কানপুরের এক হাসপাতালে ফাংগাস-সংক্রামিত গ্লুকোজ সরবরাহের ঘটনা খবর হয়েছিল কয়েকজন রোগী ঐ গ্লুকোজ খেয়ে মারা যাওয়ার পর। খোদ দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অফ মেডিকাল সায়েন্সস-এও সংক্রামিত গ্লুকোজ সরবরাহের খবর কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। কিন্তু এতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা সত্ত্বেও জাল ওষুধ তৈরীর কারবার বন্ধ করার কোন কার্যকর প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। লোকসভার সদস্যরা অভিযোগ তুলেছিলেন এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন রোগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এই কাজকারবারের বিরুদ্ধে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন গ্লুকোজ সরবরাহক কোন এক সংস্থার নাম অভিযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ঐ সংস্থা দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুটে গ্লুকোজ সরবরাহ করে কি ভাবে ?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সদস্যদের এ সমস্ত অভিযোগের ও প্রশ্নের কোনটিরই সদুত্তর দিতে পারেন নি।

(সূত্র : স্টেট্‌সম্যান, 1.4.82, 5.4.82)

শান্তি আন্দোলন—এবারে পূর্ব জার্মানিতে। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যখন যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে উত্তাল পূর্ব ইউরোপের সামাজতান্ত্রিক বলে পরিচিত দেশগুলিতে তখন এ বিষয়ে আশ্চর্য নীরবতা। এ দেশগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এর জন্য কতটা দায়ী তা নিয়ে ভাবছেন অনেকে। তবে এই পরিস্থিতির উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রূপে সম্প্রতি পূর্ব জার্মানিতে একটি শান্তি আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছে।

প্রথমে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল 'ন্যাটোর অস্ত্রসজ্জা। তখন কর্তৃপক্ষ পরোক্ষে মদতই যুগিয়েছিল এই আন্দোলনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রুশ শিবিরের সমরসজ্জা নিয়েও। আগামী দিনে এই আন্দোলন কোন দিকে যায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছেন পৃথিবীর বহু লোক। গত 13 ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ছ' হাজার তরুণ-তরুণী সমবেত হয়ে গান গেয়ে প্রকাশ করেছে আন্দোলনের মর্মকথা—'শান্তিকে শুধু একটু সুযোগ দাও' ও 'আমরা করব জয়...'।

(স্টেট্‌সম্যান, 1.4.82)

'মানস' : মনোচিকিৎসার একটি নতুন পথের খোঁজে। মনোরোগ মূলত একটি সামাজিক ব্যাধি। এ দেশে মনোচিকিৎসার প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিতে বেশীর ভাগ সময়ই মনোরোগীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এক বাতিল হওয়া চিকিৎসাপদ্ধতি, যা কার্যত এক দমনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। মনোরোগের সামাজিক মূল খুঁজে রোগীকে এক সুস্থ সৌহার্দ্যমূলক অন্তরঙ্গ পরিবেশ দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী এখানে বিরল। ফলে প্রায়ই রোগ কমার বদলে ক্রমশ বেড়ে যায়—কখনো হয়ত সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে মনের বিকার।

অসুস্থ বিকৃত সামাজিক পরিবেশে আজ প্রতিদিন মনের ভারসাম্য হারাচ্ছে বহু মানুষ। এদের জন্য চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন ধরনের ব্যাপক চিকিৎসাব্যবস্থা। 'মানস' এই প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত এক ছোট্ট অথচ উজ্জ্বল প্রচেষ্টা। 'মানস'-এর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী তার নিজের কথায়ই শোনা যাক : "মনোরোগী একটা প্রতিবাদ, একটা জীবন-সংগ্রামেরই প্রতীক। কিন্তু বিদ্রোহটি নিঃসঙ্গ, লক্ষ্যহীন। তবু প্রচলিত সমাজের সবকিছু মেনে নেওয়ার দাস্যবৃত্তির বিনিময়ে মানসিক সুস্থতার সার্টিফিকেট ক্রয় করার চেয়ে—এ বিদ্রোহ অনেক সম্মানজনক"। মনো-চিকিৎসাকে সফল করে তোলার মূল দায়িত্ব নিতে হবে 'মনোবিদ স্বেচ্ছাসেবী'দের, যারা মনোরোগীকে যোগাবে 'সামাজিক সাহায্যের বাতাবরণ'। এ শুধু তত্ত্বের বুলি নয়। 'মানস' ইতিমধ্যেই শুরু করেছে নতুন পথ খোঁজার কাজ। প্রতি শনিবার বিকাল চারটে থেকে আটটা পার্ক সার্কাসে মডার্ন স্কুলের নতুন বাড়ীতে (17 বি মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, কলকাতা-17) বসে চিকিৎসাকেন্দ্র, মনোবিদ স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও 'সামাজিকীকরণ অনুষ্ঠান'। গান-বাজনা গল্পগুজবের পথ ধরে 'চিকিৎসা' চ'লে মনোরোগীদের—আর তার সঙ্গে আমাদেরও, যারা কিনেছি 'সমাজের সবকিছু মেনে নেওয়ার দাস্যবৃত্তির বিনিময়ে মানসিক সুস্থতার সার্টিফিকেট'।

সন্ধানী।
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

আমাদের প্রকাশিত বই

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান (প্রথম/দ্বিতীয় খণ্ড)	—ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী
ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান	—ডঃ চক্রবর্তী ও ডঃ বেরা
বিংশ শতাব্দীর হিসাবশাস্ত্র	—অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর সাহা
উচ্চমাধ্যমিক বাংলা দ্বিতীয় পত্র	—জ্যোতিভূষণ চাকী ও রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
Higher secondary English Second Paper	—Profs Chakrabarty and Chatterjee
উচ্চমাধ্যমিক অর্থনীতি	—সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রদ্যোৎ গোস্বামী
সাহিত্যের ইতিহাস	—ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র
পদার্থবিজ্ঞানের অঙ্ক (প্রথম/দ্বিতীয় খণ্ড)	—ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী ও নিলীম চক্রবর্তী
পদার্থ বিজ্ঞান বিচিন্তা	—ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী ও নিলীমা চক্রবর্তী
শেক্সপীয়র	—ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য	—ড সুরেশচন্দ্র মৈত্র
শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা	—ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত
মুর্শিদাবাদ কাহিনী	—নিখিল নাথ রায়
আধুনিক দর্শন পরিচয়	—ডঃ ধীরেন দাস
সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য	—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বাংলাভাষার আধুনিকতত্ত্ব ও ইতিকথা (২য় সংস্করণ)	—ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
ফলিত জ্যোতিষ (৪র্থ সংস্করণ)	—শ্রী হরিহর মজুমদার, জ্যোতিঃশাস্ত্রী, বি.এল (কলিকাতা); এ. সি. আই. আই (লণ্ডন)
সাহিত্যের আকাশ	—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ
নৃত্ত-নৃত্য-নাট্য	—স্নিগ্ধা পাল
আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎ-সাহিত্যের সমস্যাবলী	—ডঃ সমরেন্দ্রনাথ জানা
ভারতীয় সাধনার রূপবৈচিত্র	—সুরেশচন্দ্র মৈত্র
শয়তান (টলস্টয়)	—অনুবাদ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
আঙন নদীর তীরে	—সত্যসাদ সেনগুপ্ত

১৯৮০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত :

রূপনারানের কূলে (প্রথম খণ্ড)	—গোপাল হালদার
রূপনারানের কূলে (দ্বিতীয় খণ্ড)	—গোপাল হালদার

পুথিপত্র

১ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Registration No. R. N 34929/79 "Registered" Postal Regn. No. WB/CC

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জুলাই-আগস্ট 1981 থেকে মে-জুন 1982 সময়ে প্রকাশিত প্রধান প্রবন্ধাবলীর তালিকা

জুলাই-আগস্ট 1981 : ০ হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ? —মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ০ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (1861-1944) —পার্থ সেন ০ PRL-গবেষণাগার না কি পুলিশ ব্যারাক : একটি সাক্ষাৎকার —পার্থ সেন, অংশুতোষ খান ও রবীন চক্রবর্তী।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1981 : ০ নতুন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি : সমস্যা ও সম্ভাবনা —হিরন্ময় সাহা ০ আকুপাংচার : অসাড়তা সৃষ্টির ব্যথা —অভিজিৎ লাহিড়ী ০ মাছ খাওয়ার অভ্যাস কি হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায় ? —গৌতম ব্যানার্জি।

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1981 : ০ মাইকেল ফ্যারাডে : জীবন ও সময় —রবীন মজুমদার ০ মানবদেহে পরীক্ষা-নীরীক্ষ : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা —সুখময় ভট্টাচার্য ০ 'বুদ্ধি' সম্পর্কিত কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে —কল্যাণ গুহ।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1982 : ০ চিকিৎসক ও ভাস্কর - সঞ্জা মিত্র ০ বিতর্ক মঞ্চ : হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ? —টি. আহ্‌মেদ ইত্যাদি ও মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ০ দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী —স্বপন সোম।

মার্চ-এপ্রিল 1982 : ০ সৃষ্টিবাদ বনাম বিবর্তনবাদ : একটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই —পার্থপ্রতিম মজুমদার ০ ভারতীয় বিজ্ঞান-ঐতিহ্য পঠনের রূপরেখা —সত্যবান রায় ০ ওষুধের কথা —সুখময় ভট্টাচার্য।

মে-জুন 1982 (এই সংখ্যা) : ০ চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান-ভাবনা —সৌমেন গুহ ০ যুদ্ধের সেবায় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান —মনন সেনগুপ্ত ০ বিতর্ক মঞ্চ : হোমিওপ্যাথি —(সংকলন)।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে —'উৎস মানুষ' ও 'সৃজনী'র (বর্তমানে 'মানস') যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত যোগাযোগ : 17B মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা 17);

কল্যানী ঘোষপাড়ায় সতীমা'র মেলা ও কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায় —মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 100 বসন্ত বাবু রোড, কাঁচরাপাড়া থেকে প্রকাশিত);

মালা বাড়ে রোগ সারে — অশোক বন্দোপাধ্যায় —উৎস মানুষ, বি. ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64;

গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন ? একটি প্রাথমিক খসড়া —মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক নি-6,119 কল্যানী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত);

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে রূপলেখা 22 সীতারাম ঘোষ কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত